
আম্রপালী
নারায়ণ সান্যাল

আম্রপালী

নারায়ণ সান্যাল

দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা 700 073



আম্রপালী

নারায়ণ সান্যাল



AMRAPALI
A Bengali Novel *by* NARAYAN SANYAL
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 50.00

ISBN-81-7079-010-7

রচনাকাল : জুলাই-আগস্ট 1991
গ্রন্থক্রমিক : 88
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা মাঘ ১৩৯৮, জানুয়ারি 1992
তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১১, আগস্ট 2004
চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪১৬, নভেম্বর 2009

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

অলংকরণ : লেখক

প্রুফ-নিরীক্ষা : সুবাস মৈত্র

৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

'সুন্দরম্' নাট্যগোষ্ঠীর কুশীলবদম্পতি
শ্রীমতী শর্মিলা মৈত্র
শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার মৈত্র
যুগলকরকমলেষু

'আম্রপালী'-সহোদর
বিষয়ভিত্তিক
[আমাদের প্রকাশনা * চিহ্নিত]

আম্রপালীর অগ্রজ

[কালানুক্রমিক]

1 মুশকিল আসান '54
2 বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প '55
3 বল্মীক '55
4 গ্রাম্যবাস্তু '56
5 পরিকল্পিত পরিবার '57
6 বাস্তু-বিজ্ঞান '59
7 ব্রাত্য '59
8 দশেমিলি '59
9 মনামী '60
10 অরণ্যদণ্ডক '61
11 দণ্ডকশবরী '62
12 Handbook on Estimating '63
13 অলকনন্দা '63
14 মহাকালের মন্দির '64
15 নীলিমায় নীল '64
16 পথের মহাপ্রস্থান '65
17 সত্যকাম '65
18 অন্তর্লীনা '66
19 অজন্তা অপরূপা '68
20 তাজের স্বপ্ন '69
21 নাগচম্পা '69
22 নেতাজী রহস্য সন্ধানে '70
23 'আমি নেতাজীকে দেখেছি '70
24 পাষণ্ডপণ্ডিত '70
25 কালোকালো '71
26 শার্লক হেবো '71
27 জাপান থেকে ফিরে '71
28 আবার যদি ইচ্ছা কর '72
29 কারুতীর্থ কলিঙ্গ '72
30 গজমুক্তা '73
31 আমি রাসবিহারীকে দেখেছি '73
32 বিশ্বাসঘাতক '74
33 হে হংসবলাকা '74
34 সোনার কাঁটা '75
35 মাছের কাঁটা '75
36 অশ্লীলতার দায়ে '75
37 লালত্রিকোণ '75
38 আজি হতে শতবর্ষ পরে '76
39 অবাক পৃথিবী '76
40 নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা '76
41 পঞ্চাশোর্ধ্বে '76
42 পথের কাঁটা '76
43 চীন-ভারত লঙ মার্চ '77
44 হংসেশ্বরী '77
45 প্যারাবোলা স্যার '77
46 ঘড়ির কাঁটা '78
47 কুলের কাঁটা '78
48 আনন্দস্বরূপিণী '78
49 লিন্ডবার্গ '78
50 তিমি-তিমিঙ্গিল '79
51 কিশোর অমনিবাস '80
52 ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন '80
53 গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা '80
54 গ্রামের বাড়ি '80
55 অরিগামি '82
56 লা-জবাব দেহ্‌লী অপরূপা আগ্রা '82
57 না-মানুষের পাঁচালী '83
58 সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম '83
59 সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় '84
60 রাস্কেল '84
61 Immortal Ajanta '84
62 Erotica in Indian Temples '84
63 রোদ্যাঁ '84
64 ষাট-একষট্টি '84
65 মিলনান্তক '85
66 নাক-উঁচু '85
67 ডিজনেল্যান্ড '85
68 উলের কাঁটা '86
69 লাডলি বেগম '86
70 পূরবৈয়াঁ '86
71 প্রবঞ্চক '87
72 অ-আ-ক-খুনের কাঁটা '87
73 পয়োমুখম্ '87
74 নামানুষী 'বিশ্বকোষ' -এক '88
75 অচ্ছেদ্যবন্ধন '88
76 নামানুষের কাহিনী '88
77 সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা '89
78 ছয়তানের ছাওয়াল '89
79 হাতি আর হাতি '89
80 আবার সে এসেছে ফিরিয়া '89
81 ছোঁবল '89
82 রূপমঞ্জরী-এক '90
83 নামানুষী বিশ্বকোষ -দুই '90
84 কাঁটায় কাঁটায়-এক '90
85 কাঁটায় কাঁটায়-দুই '90
86 গাছ-মা '91
87 মান মানে কচু '91

কৈফিয়ৎ

ফ্রেডেরিক ফোরসাইথ — সেই যে লেখকের The Day of the Jackal এক সময় রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিল— তাঁরই লেখা একটা ছোটগল্পের সংকলন হাতে এল : No Comebacks। দশটি অনবদ্য ছোটগল্প। পর পর দুটিকে 'ঝিন্দের কারাগারে' বন্দী করে ফেললাম। একটি :'Money with Menaces' হয়ে গেল 'আম্রপালী', অপরটি, 'Privilege', একই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে : 'মান মানে কচু'।

পাণ্ডুলিপি অবস্থায় মুষ্টিমেয় যে-কজন 'আম্রপালী' পড়েছেন তাঁদের একজনের প্রশ্নে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছি। উনি বললেন, "খোলাখুলি বলুন তো দাদা, আপনি কী? দক্ষিণপন্থী না বামপন্থী? দিল্লীতে শান্তি বিঘ্নিত করে যে পথ-নটুয়া মারাত্মক বিদ্রোহের বাণী প্রচার করছিল, মনে হচ্ছে আপনি তার প্রতি সহানুভূতিশীল; আবার এদিকে বানতলার হাটে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভেও আপনার প্রতিবাদ! তাহলে আপনি কোন দলে?"

আমার মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল তা আর জানতে চাইনি : "আপনি নিজে কোন দলে? মাফিয়া?"

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভোটদাতাদের পোলারাইজেশন দিন-দিন জোরদার হয়ে উঠছে। সর্বত্র। ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে, ব্যবসায়ের চৌহদ্দি নিয়ে, ফুটপাথের দখল, হকারস্টল, খেলা, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাকে দল বেছে নিতে হবে — হয় ডান, অথবা বাম। সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংক্রামিত হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের পরিমণ্ডলেও। প্রাবন্ধিকেরা তো বটেই, কথাসাহিত্যিক, এমনকি কবির দল, ইদানীং হয় উত্তর-মেরুতে, নয় দক্ষিণ-মেরুতে। শুধু মস্তিষ্ক বা লেখনী নয়, পদচালনাও এখন ঐ ছন্দে বাঁধা। কেউ এ-দলের শোভাযাত্রায় পদযাত্রা করছেন, কেউ ও-দলের প্রতিবাদ-মিছিলে।

রাজনৈতিক দাদাগিরির তোয়াক্কা না রেখে 'ভালকে ভাল' আর 'মন্দকে মন্দ' বলার হিম্মৎই যদি না রইল তবে কিসের এই সাহিত্যসেবার ভড়ং? কথাসাহিত্যিক শুধুমাত্র সত্য-শিব-সুন্দরের পক্ষাবলম্বন করতে পারবে না? বিশেষ সেই অন্তেবাসী কথাসাহিত্যিকের যদি পাঠক-পাঠিকার ভালবাসা ব্যতিরেকে আর কোনও পার্থিব কামনা-বাসনা না থাকে?

আর একজন জানতে চেয়েছিলেন : ভাগলপুর জেলের ভিতর কয়েকজন নিষ্ঠুর পুলিস যেভাবে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল, যেভাবে বিচারাধীন আসামীদের অন্ধ করে দিয়েছিল সেটাকে কি আপনি সমর্থন করেন?

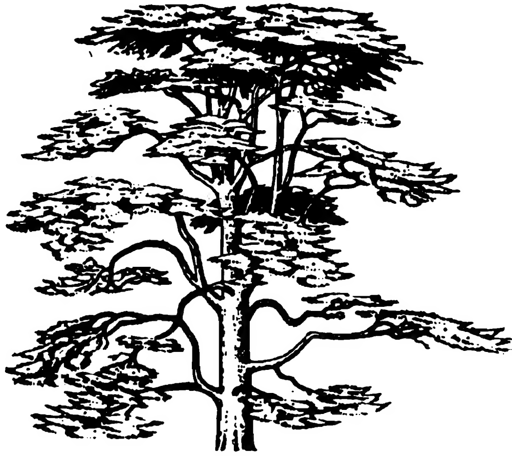
জবাবে বলেছিলাম, আমার দায়িত্ব গল্প বলার। আমি নীতিবাগীশ প্রবন্ধকার নই। তা ভাল কথা, আমার গল্পের নায়ক যেভাবে সমাধানে পৌঁচেছিল আপনি কি সেটাকে পাঠক হিসাবে সমর্থন করেন না?

উনি এককথায় বলেন, এককথায় এর জবাব হয় না।

আমি বলি, তাহলেই আমি খুশি। ভাবুন, আরও ভাবুন! কল্পনায় অনুরূপ অবস্থায় নিজেকে স্থাপন করে ওর চেয়ে ভাল সমাধান খুঁজে পেলে আমাকে জানাবেন। আমিই না হয় আমার নায়কের মতো যথাযোগ্য সম্মানমূল্যে প্লটটা আপনার কাছ থেকে কিনে নেব। আর একটা গপ্পো ফাঁদব।

নারায়ণ সান্যাল

নভেম্বর '91



ট্যাক্সির সিটে সেদিন যদি ঐ বিচিত্র পত্রিকাখানা আবিষ্কার না করতেন, তাহলে ওঁর জীবনে এ দুর্ঘটনা আদৌ ঘটত না। সেক্ষেত্রে চরিত্রবান বিজ্ঞানসাধকের মাথায় এতবড় কলঙ্কের বোঝাটা চাপত না। আর আমাকেও এই 'অশ্লীল' গল্পটা লেখার যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। কিংবা ধরা যাক, সেদিন সকালে ওঁর গাড়িতে যদি স্টার্টিং-ট্রাব্‌ল্ না দেখা দিত, নিজের গাড়ি নিয়ে নিত্যদিনের মতো যদি কলেজে আসতেন, তাহলেও কি এই অঘটনটা ঘটত? আদৌ না!

তো—বাস্তবে সেসব যে ঘটেনি। সকালে গাড়িটা কিছুতেই স্টার্ট নিল না। গ্যারেজ আর গাড়ির চাবির থোকা ছট্টুলালের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কলেজে চলে এসেছেন। যোধপুর পার্ক থেকে কলেজ স্ট্রিটে। ছট্টুলাল চেনা লোক, ওঁর বাড়ির সামনে তার রিপেয়ার গ্যারেজ। সারাদিনে সে গাড়িটা সারিয়ে রাখবে।

আসলে ঘটনাটা তো কলেজে আসবার সময় ঘটেনি, সেটা ঘটল ফেরার পথে। নিতান্ত আকস্মিকভাবে। অন্তত সে সময় তাই মনে হয়েছিল। একটা কাকতালীয় যোগাযোগ —কার্যকারণসম্পর্ক-বিরহিত।

কলেজ থেকে যখন বের হলেন তখনো সন্ধ্যা নামেনি, কিন্তু অফিসফেরত যাত্রীর ভিড়ে বাসের পাদানি উপচীয়মান। প্রফেসর রঞ্জন তালুকদারের বয়স হয়েছে। শিক্ষাবিভাগ না হলে এতদিনে পেনসন-ফাইল তৈরিতে মন দিতে হত। সরকারি চাকুরি থেকে রিটায়ারমেন্টের অনেক বাকি, কিন্তু মনুর বিধান মেনে পঞ্চাশোর্ধ্বের পূর্বেই বানপ্রস্থ নিয়েছেন। মানসিকভাবে। তা কেন? শারীরিকভাবেও। 'বন' কি এই কলকাতা-শহর চৌহদ্দির বাইরে? বন এখন ঘরে ঘরে, বন এখন মন-এ মন-এ। এমনিতে শরীরে জরার আক্রমণ অনুভব করেন না। নিত্যপ্রাতে যোগাভ্যাস করেন।

ইদানীং। আগে সকালে জগিঙে যেতেন। পাশের বাড়ির সমবয়সী পরেশবাবুর সঙ্গে। পরেশবাবু মারা যাবার পর জগিঙটা বন্ধ হয়েছে। তবু শরীর অটুট। এখনও সকালে আর সন্ধ্যায়—দিনে দুবার—প্রণতিকে পাঁজাকোলা করে বাথরুমে নিয়ে যেতে পারেন। যানও। হুইল-চেয়ারটা বাথরুম-দরজার চেয়ে মাপে বড়। প্রণতি অবশ্য কঙ্কালসার—দশ বছর শয্যাশায়ী—কতই বা ওজন ওর ? আর্থারাইটিস্ ছাড়াও নানান স্ত্রীরোগে একনাগাড়ে ভুগেই চলেছে।

পাব্‌লিক-বাস ধরবার চেষ্টা করা অহেতুক। নাকের সামনে দিয়ে একটা ডব্‌ল-ডেকার বাদুড়ঝোলা অবস্থায় 'কাকে-খাই কাকে-খাই' করতে করতে বেরিয়ে গেল। মনস্থির করলেন : ট্যাক্সিই নিতে হবে। কিন্তু ট্যাক্সি ধরা কি অতই সোজা, এই পড়ন্ত বেলায় ? যখন এই এত-ভঙ্গ বঙ্গ দেশটার রঙ্গভরা কেরানিকুল ঘরে ফেরার তাগাদায় জানকবুল। লাখ-লাখ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর চলেছে ঘরমুখো। লোড-শেডিং-এর আঁধারে চিন্তাকুল চিন্তামণির দল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমাণা। তাই ওরা টের পায় না—কী চেপে ধরে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরছে—বাসের হ্যান্ডেল না অজগর সাপ ! আর এই মওকায় ট্যাক্সিওয়ালারা সাময়িক 'আবু হোসেন'—আড়াই ঘণ্টার 'হঠাৎ নবাব।' —'কোথায় যাবেন স্যার ?' অর্থাৎ যদি তুমি ওর গন্তব্যস্থলের দিকে দু-কদম এগিয়ে যেতে চাও শুধু তাহলেই কিঞ্চিৎ অর্থমূল্যের বিনিময়ে সে তোমাকে একটা লিফ্‌ট দিলেও দিতে পারে। কেউ কেউ আবার সাঁঝের ঝোঁকে রূপান্তরিত হয়ে যায় শেয়ারের ট্যাক্সিতে। আবার বেশ কিছু ড্রাইভার হাওড়া স্টেশান বা এয়ারপোর্ট ছাড়া অন্যত্র পাদমেকং নগচ্ছামঃ।

হঠাৎ একটি সুদর্শন ছেলে এগিয়ে এসে বলে, আজ গাড়ি আনেননি স্যার ?

নির্ঘাৎ কলেজের। কোন ইয়ার ? মুখটা চেনা-চেনা। বললেন, না, আজ গাড়ি আনিনি। একটা ট্যাক্সি ধরব ভাবছি ; কিন্তু...

—আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি ধরে দিচ্ছি। বাড়িই ফিরবেন তো ? যোধপুর পার্ক ?

ওরে বাবা ! শুধু নাম নয়, এ যে ধামও চিনে বসে আছে। বলেন, না, না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। অপেক্ষা করতে করতে নিশ্চয় পেয়ে যাব একসময়।

—বিলক্ষণ ! তা আর বলতে ! আর তর্কের খাতিরে ধরুন যদি না-ই পান, ক্ষতি কী ? কাল সকালে তো আবার ফিরেফিত্তি এই আমড়াতলার মোড়েই আসতে হবে। ফার্স্ট পিরিয়ডেই ক্লাস। রাতটা কেটে গেলে সোজা ক্লাসে ঢুকে যাবেন। যাতায়াতের ট্যাক্সিফেয়ারটা বাঁচবে !

ওর চোখে-মুখে কথা বলার ধরনে হেসে ফেলেন প্রফেসর তালুকদার। বলেন, কোন ইয়ার ?

ছেলেটি ট্যাক্সির সন্ধানে চল্‌তে শুরু করেছিল। এ-কথায় থমকে থেমে পড়ে। ফিরে ঘনিয়ে আসে আবার। হেসে বলে, সে-কথা যে বলা বারণ, স্যার ! আমি চেয়েছিলাম শুধু 'পজেটিভ ক্যাটালিস্ট'-এর পার্টটুকু প্লে করতে। এনজাইমের মতো। আপনার সঙ্গে ট্যাক্সির সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে আমি থাকতে চেয়েছিলাম, ঐ যাকে বলে 'আন্‌ডিস্টার্বড ইন ম্যাস্ অ্যান্ড কেমিক্যাল কম্পোজিশান'।

রসায়নবিদ রসিক মানুষটি খুশি হলেন ওর বাকচাতুর্যে। প্রতিপ্রশ্ন করেন, আমি তোমার রোল-নাম্বারটা জেনে ফেললে তোমার 'পজেটিভ ক্যাটালিস্ট'-এর ভূমিকাটুকু অব্যাহত থাকবে না ?

ঘাড় চুলকে লাজুক লাজুক মুখে বললে, কেমন করে থাকবে স্যার ? আমার 'প্রক্সিলাভ' বন্ধ হয়ে যাবে না ?

উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন অধ্যাপক তালুকদার।

ঠিক তখনই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় রাস্তার 'কার্ব' ঘেঁষে।

ট্যাক্সিতে একজনমাত্র যাত্রী। নিঃসন্দেহে মুসলমান। দাড়ি, কাজ-করা সফেদ টুপি আর রসুনের গন্ধেই তা আন্দাজ করা যায়। মুখে বসন্তের দাগ। বছর সাতাশ-আঠাশ বয়স। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল। তালুকদার-সাহেব তাঁর বয়সের অনুপাতে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন : যানা হ্যায় ? যোধপুর পার্ক ?

—কেঁউ নেহি ? উঠিয়ে...

অধ্যাপকমশাই পিছনের সীটে উঠে বসলেন। ড্রাইভার পুনরায় মিটার ডাউন করল। ছেলেটি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তখনো। হাত তুলে নমস্কার করল। প্রফেসর ওকে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বললেন। ছেলেটি এগিয়ে এলে জনান্তিকে বললেন, কৃষ্ণা অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে !

ছেলেটি অবাক হল। ম্যাগাজিন-স্টলের কাছে থার্ড-ইয়ারের কৃষ্ণা সেনকে অপেক্ষা করতে বলে ও যে এগিয়ে এসেছিল তা উনি জানলেন কেমন করে ? ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল। কৃষ্ণা একমনে মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্‌টাচ্ছে। যেন এদিকে ওর নজরই নেই।

—আরও একটা কথা।

প্রফেসর তালুকদারের কণ্ঠস্বরে আবার এদিকে ফেরে। উনি বলেন, একটা কথা ভুলো না, 'এনজাইম' ! প্রক্সিতে ম্যাটিনী-শোর ফার্স্ট ক্লাস টিকিট পাওয়া সহজ, অনার্সের ফার্স্ট ক্লাস টিকিট নয় কিন্তু !

ছেলেটি সত্যিই লজ্জিত। বললে, আয়াম সরি, স্যার ! দেবু রায়। ফোর্থ ইয়ার।

—কেমিস্ট্রি ?

—না, স্যার। কেমিস্ট্রিতে অনার্স থাকলে কি আর চিনতে পারতেন না ?

ফিজিওলজি।

সর্দারজি তাগাদা দেয়, অব চলুঁ ?

—চল।

অপরাহ্ণের আলো কলকাতার সৌধশ্রেণীর মায়া কাটাতে পারছে না। রাস্তা ছায়া ছায়া। পথের বাঁ-দিকে সারি সারি বাড়ির মাথায়-মাথায় লেগে আছে সোনা-গলানো রোদের ছোপ—জলের ট্যাঙ্কিতে, চিলে-কোঠায়, পারাবত-কূজিত কার্নিশে। নজর হল দেবু এগিয়ে এসে কৃষ্ণার কর্ণমূলে কিছু বলছে। কৃষ্ণা আড়চোখে অপসৃয়মাণ ট্যাক্সিটাকে দেখে নিয়ে জিব কাটল। থার্ড-ইয়ারের কৃষ্ণা সেন ভেবেছিল 'আর. কে. টি.' ওকে দেখলেও চিনতে পারবেন না। কিন্তু প্রফেসর তালুকদারের স্মরণশক্তি অতি প্রখর। যে-কারণে জীবনে কখনো সেকেন্ড হতে পারেননি, বরাবর ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট ! ঐ মেয়েটি একবার সোস্যালে গান গেয়েছিল। দুর্দান্ত গেয়েছিল —তখন তার নাম ঘোষিত হয়েছিল। উনি ভোলেননি।

হাতের ফোলিও ব্যাগটা পাশের সীটে রাখতে গেলেন। নজরে পড়ে, সেখানে ভাঁজকরা একখানা খবরের কাগজ। উর্দু দৈনিক। খুব সম্ভবত ঐ পূর্ববর্তী মুসলমান যাত্রীটি অনবধানে ফেলে গেছে। অথবা কৌতূহল অবসানের উচ্ছিষ্ট। বোধহয় 'ইত্তেফাক'। কাগজটা সরিয়ে ফোলিও ব্যাগটা ওখানে রাখতে যাবেন ঠিক তখনই কাগজের তলা থেকে কী একটা মাসিক পত্রিকা পিছলে পড়ে গেল ট্যাক্সির চাতালে। অন্যমনস্কভাবে সেটা তুলে নিতে গিয়েই যেন একটা শক্ খেলেন। দ্রুতহস্তে পত্রিকাখানা চাপা দিলেন দৈনিকপত্রের নিচে। মনে মনে যেন বললেন : সরি।

মেয়েটি যে ইত্তেফাক-পর্দা ফাঁক রেখেই বসন পরিবর্তন করছিল তা আন্দাজ করতে পারেননি।

কিন্তু এ কী ?

এমনটা তো কখনো হয় না। হবার কথাও নয় ! চিত্রপ্রদর্শনীতে অথবা ছবির বইতে ন্যূড কি দেখেননি, দেখেন না ? এখানে অবশ্য কিছুটা প্রভেদ আছে। মাসিক পত্রিকার মলাটে ওটা হাতে আঁকা ছবি নয়, রঙিন আলোকচিত্র। ফটোগ্রাফিকে যতই জাতে তুলবার চেষ্টা কর, হাতে-আঁকা ছবির আবেদনই আলাদা। সেটা পুরোপুরি আর্ট ; আলোকচিত্রের মতো আধা-আর্ট আধা-ক্রাফট্ নয়। তাই চিত্রে, এমনকি ভাস্কর্যেও ন্যূড যতটা শিল্পমণ্ডিত, আলোকচিত্র ততটা নয় ! বিদ্যুৎঝলকের মতো এক নজর দেখেছেন মাত্র ; কিন্তু তার মধ্যেই ওঁর মনে হয়েছে প্রচ্ছদপটের মেয়েটি—নাকি মহিলাটি— বিবস্ত্রা ঠিক নয়, সযত্ন-সচেতনতায় অর্ধাবৃতা। লুটিয়ে পড়া আঁচলটাকে সে যখন নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই অসতর্ক মুহূর্তেই অসভ্য ফটোগ্রাফারটা....

কিন্তু একটা কথা !

দোষটা তো পুরোপুরি ক্যামেরা-ম্যানের ঘাড়ে চাপানো যাবে না সোনামণি ! ষড়যন্ত্রের অংশীদার তুমি নিজেও। না হলে শাড়ি পরার পূর্ববর্তী পর্যায়ে তোমার পরিধান করার কথা নয় কি—পেটিকোট-ব্রা-ব্লাউস ? আর তাছাড়া লুটিয়ে-পড়া আঁচলটাকে তুলে নেবার ভঙ্গিমার আড়ালে কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়ে গেল না—কেমন যেন একটা তির্যক প্রয়াস : আবৃত হওয়ার অপেক্ষা সযত্নে অনাবৃত হওয়ার ?

অধ্যাপক তালুকদারের কান দুটো একটু গরম হয়ে উঠেছে। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন-ছন্দ তেহাইয়ের বোল না তুললেও বেশ কিছুটা দ্রুত লয়ে....

'যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ....'

জানেন, জানা আছে ওঁর। বহির্জগতে কোনও চাঞ্চল্যের লক্ষণ অনুভব করলে কূর্ম তার হাত-পা-মাথা দেহবর্মের ভিতরে লুকিয়ে ফেলে। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতও তেমনি তাঁর ইন্দ্রিয়সম্মুখে উপস্থিত চিত্তচাঞ্চল্যের প্রত্যক্ষ হেতুটিকে উপেক্ষা করেন। পঞ্চেন্দ্রিয়কে স্বীয় বশে এনে রাশটানা ঘোড়ার মতো...

তাকিয়ে দেখলেন একবার সামনের দিকে। সর্দারজি একমনে ড্রাইভ করছে। নজর করে দেখলেন ওর ভিয়ু-ফাইন্ডারটিকেও। না, কেউ কোনভাবেই ওঁকে লক্ষ্য করছে না।

চলন্ত ট্যাক্সির গর্ভে তিনি মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণের মতো একান্ত।

অস্বীকার করার উপায় নেই অধ্যাপক তালুকদারের দ্বৈত সত্তার। তিনি কলেজে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির ক্লাস নেন, খাতা দেখেন, রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টদের ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার দিকে গলফের বলের মতো ঠেলে ঠেলে দেন, 'ছাত্র-অধ্যাপক কল্যাণ সমিতি'র সেক্রেটারি, কিন্তু সেখানেই তাঁর পরিচয় শেষ হয় না। তিনি লেখক, তিনি ঔপন্যাসিক, তিনি কবি।

অবশ্য ছদ্মনামে। ওঁর মনে হল, ইত্তেফাকের দমবন্ধকরা অন্ধকূপে এতক্ষণে মেয়েটি মুমূর্ষু।

কাগজের তলা থেকে দ্বিতীয়বার উদ্ধার করে আনলেন ওকে। দেখলেন। এবার আর বিদ্যুৎঝলককে নয়। কত বয়স হবে মেয়েটির ? সাতাশ-আঠাশ ? বিয়ের সময় প্রণতির যে বয়স ছিল আর কি ! প্রায় বিশ-ত্রিশ বছর আগে। তখন তো সে এমন শয্যাশায়ী পঙ্গু ছিল না।

পঁচিশ বছর ! উফ্ ! শতাব্দীর একপাদ !

কিন্তু এ-কথাও তো বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, প্রণতি যদি বন্ধ্যা না হত, তাহলে ওঁর নিজেরও এতদিনে ঐ বয়সের একটি কন্যাসন্তান থাকতে পারত !

কথাটা মনে হতেই পাতাটা উল্টে দিলেন।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা। নাম 'পত্রমিতালী'। এটি প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা। পার্ক সার্কাসের একটি ঠিকানা থেকে প্রকাশিত। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : পত্রবন্ধুত্বে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই এ পত্রিকার মূল লক্ষ্য। বিদেশে নাকি এই জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করে অনেকে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর সন্ধান পেয়েছে। অন্তত সম্পাদক তো তাই দাবী করেছেন। তা বলে এখানে শুধু পাত্রপাত্রীর সন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এই জটিল দুনিয়ায় একই চিন্তাধারার দুটি মানুষ—তারা নর ও নারী নাও হতে পারে—হয়তো দুটি রমণী অথবা দুটি পুরুষ, পরস্পরের কাছে হৃদয়ের ভার নামিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে চেয়েছে, সান্ত্বনা খুঁজেছে। মাত্র তৃতীয় সংখ্যার ভিতরেই প্রায় সত্তরটি পত্রবন্ধুত্ব-প্রার্থী ছেলে ও মেয়ের সন্ধান সম্পাদক-মশাই পেয়েছেন। তাদের, নামের ক্রমানুসারে তালিকাকারে শেষ ফর্মায় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। পত্রিকায় এ জাতীয় বিজ্ঞপ্তি দিতে গেলে একটা 'মেম্বারশিপ-ফি' দিতে হয় ; কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কোনো সাধারণ পাঠক বা পাঠিকা যোগাযোগ করতে চাইলে 'ফি' দিতে হবে না। পত্রমিতালী যারা চেয়েছে তারা শুধুমাত্র এক-একটি ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা সূচিত। 'নাম' কোনক্ষেত্রেই জানানো হয়নি। তাদের সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা কিছু খবর আছে—কত বয়স, পড়াশুনা কত দূর, কী কী হবি, পুরুষ অথবা স্ত্রী। বিবাহিত-অবিবাহিত অথবা বিধবা/বিপত্নীক। ছাত্র, চাকুরে, ব্যবসায়ী অথবা অবসরপ্রাপ্ত। সংসারে তিক্ত-বিরক্ত তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে সংসার কর্তৃক পরিত্যক্ত অথবা উপেক্ষিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবরকমই আছে।

কোনো পাঠক বা পাঠিকা যদি কাউকে চিঠি লিখতে চায়, তাহলে বিশেষ সংখ্যাকে সম্বোধন করে চিঠিখানি লিখতে হবে। খামে ভরতে হবে। বন্ধ খামে ডাকটিকিট সেঁটে খামের পিছনে পেনসিলে ক্রমিক সংখ্যাটি লিখতে হবে। এবার একটি বৃহত্তর খামের গর্ভে তাকে ভরে দিতে হবে। ঐ সঙ্গে বড় খামে দিতে হবে স-টিকিট একটি 'সেলফ্-অ্যাড্রেস্ড্' খালি লেফাফা। তারপর বড় খামে সম্পাদকের নাম-ঠিকানা লিখে ডাকে দিতে হবে।

পাকা ব্যবস্থা। সম্পাদক যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। অবাঞ্ছিত সমাজবিরোধী মানুষ যাতে পত্রমিতালী-প্রার্থীকে বিড়ম্বিত, বরং বলা উচিত বিড়ম্বিতা করতে না পারে তাই এত সাবধানতা। তবে হ্যাঁ, 'পত্রমিতালী' প্রতিষ্ঠার পর সম্পাদকের আর কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না— এ বিজ্ঞপ্তিও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত।

সূচীপত্রে পরিচিত নাম একটাও খুঁজে পেলেন না। একটি ছোট গল্প, কবিতা গুটি তিনেক—নিতান্ত মামুলী। প্রবন্ধ একটি, পতিতাবৃত্তির উপর। সচিত্র, সোনাগাছি,

হাড়কাটা গলির। মামুলী। একটু যৌনতা ঘেঁষা। অশ্লীল নয় তা বলে।

প্রফেসর-সাহেব মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিলেন—যোধপুর পার্ক দূর অস্ত্। সর্দারজি স্টিয়ারিং হুইলে নিমগ্ন। কলকাতার রাস্তার ধারে সারি সারি বাড়ি পিছনে ছুটছে। উনি পত্রমিতালীর তালিকা ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। সাহিত্যসেবী হলেও বিজ্ঞানীর মন। উনি মনে মনে পত্রবন্ধুত্বকামেচ্ছুদের বেশ কয়েকটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে ফেলতে পারলেন। প্রথম দল অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে। তারা প্রায়শই ছাত্রছাত্রী। যৌবনের সিংহদ্বারে সদ্য উপনীত। ওঁর বাল্যকালে ছেলে-মেয়েদের পৃথক স্কুলে পড়তে হত। মাত্র কয়েকটি কলেজে ছিল কো-এডুকেশন। একই ক্লাসের ছেলে মেয়েরা বিপরীত লিঙ্গের ক্ষেত্রে 'আপনি' বলে কথা বলত। ওঁর নিজের কৈশোরে, যে বয়সে উনি একটা অজানা জগতের ইশারা পেয়ে চঞ্চল হতেন, আজকালকার দিনে সেটা ওদের কাছে আর 'অজানা' নয়। ওঁদের ছাত্রকালে যে-তথ্যটা পাঠ্যসূচি থেকে সযত্নে পরিহার করা হত, সেই জীবনসত্যটা আজকে জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। হয়তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, এই যা। এরা সকলেই বন্ধু বা বান্ধবীর সন্ধান করছে। স্পষ্ট বলা নেই, কিন্তু লক্ষ্য:ভিন্ন লিঙ্গের পত্রবন্ধুত্ব। ওরা বিপরীত-প্রান্ত থেকে একটু সমমর্মিতা চায়। একটু সহানুভূতি, সান্ত্বনা, পরস্পরের কাছ থেকে উৎসাহ আশার বাণী শুনতে চায়। কেউ জানিয়েছে তার সঙ্গীতে আসক্তি, কেউ ক্রিকেটে, কেউ বা টি. ভি. সিরিয়ালে। দু একজন জানিয়েছে টি. ভি, সিনেমা, নিতান্ত না হলে গ্রুপ-থিয়েটারে নামতে চায়, অথচ বাড়িতে আপত্তি। এ নিয়ে অশান্তি। এই হচ্ছে প্রথম গ্রুপ।

দ্বিতীয় একটি গ্রুপের আভাস পেলেন যারা 'নাল্পেসুখমস্তি' মন্ত্রে বিশ্বাসী।' দেখাই যাক না, ঘটনা কতদূর গড়ায়'—ভাবখানা ওদের। এরা বিবাহিত কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু বৈচিত্র্যসন্ধানী। এক্ষেত্রে XX সন্ধান করছে XY-এর। এবং কনভার্সলি। অর্থাৎ ক্রমোজমের হিসাবে।

তৃতীয় একটি গোষ্ঠী—তারা উত্তর-চল্লিশ—যেন গুন্‌গুন্ করে গাইছে : 'ঘরের কোণে ভরা পাত্র, দুই বেলা তা পাই/ঝরনাতলার উছলপাত্র নাই।'

এরা যৌবনের হারিয়ে যাওয়া রোমাঞ্চটিকে ফিরে পাওয়া যায় কিনা তাই পরখ করে দেখতে চায়— ঘরণী বা গৃহস্বামীর দৃষ্টির আড়ালে।

এ-ছাড়া আরও একটি গ্রুপে আছেন কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। পড়ন্ত বিকালের বৈঠকের সভ্য-সভ্যা। এঁরা অবসরপ্রাপ্ত। সংসারে তাঁদের আকর্ষণ কম, বন্ধন ক্ষীয়মাণ। সময় কাটতে চায় না। সবারই বাড়িতে কিছু টি. ভি. বা ভি. সি. পি. থাকে না। সঙ্গী একমাত্র লাইব্রেরি। তাও যাঁদের চোখের দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ। ছেলেমেয়ে, ছেলের বউ, জামাই, নাতি-নাতনি—হয়তো ভগবান অকৃপণ হাতেই দিয়েছেন, কিন্তু তাদের কাছে ওঁরা

বোঝা মাত্র। তাদের আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হলে তারা সংযত হয়ে পড়ে, আড়ষ্ট হয়ে পড়ে—ভাবখানা, যেন মনে মনে বলে '—এই এলেন সর্বঘটের কাঁঠালিকলা।' প্রকাশ্যে : 'ও ঠাম্মা ! তুমি আবার এখানে উঠে এলে কেন ?'

দিনযাপনের গ্লানি কাটাতে তাঁরা কিছু সমমর্মী মানুষ খুঁজছেন। পত্রমিতালীর মাধ্যমে।

এই তিন-চার শ্রেণীর নরনারীর ভিড়ে গুটিকতক চিঠি নিতান্ত বিভ্রান্তিকর। বলা যায় 'অড-উয়োম্যান আউট'। বিজাতীয়া। এমন পাঁচখানা চিঠি অন্তত নজরে পড়ল ওঁর, ঐ অল্প সময়ে।

এরা কী ? এরা কে ? এরা কী চায় ?

পাঁচটি চিঠিই এক বিশেষ এজ-গ্রুপের : পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। অব্যতিক্রম মহিলা। নিজ নিজ স্বীকৃতি-মোতাবেক পাঁচজনেই চাকুরে, একান্তচারিণী। দুইজন ডিভোর্সি, দুজন বিধবা, একটি আজন্মকুমারী।

কেন এরা ব্যতিক্রম ? শোন, বুঝিয়ে বলি, লক্ষ্য করে দেখ—বয়স, শিক্ষাগত মান, হবির তালিকা জানিয়েই এরা থামেনি, জানিয়েছে উচ্চতা, গাত্রবর্ণ, সৌন্দর্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এবং ওজন। পত্রমিতালীর পক্ষে এ-জাতীয় সংবাদ কি প্রাসঙ্গিক ? সবচেয়ে বিস্ময়কর : একটি ডিভোর্সি মেয়ে জানিয়েছে তার উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন, বয়স ত্রিশ, সে চাকরিরতা এবং তার হবি : 'স্ট্যাটিস্‌টিক্স্'।

অপিচ, তার নিজস্ব 'ভাইটাল' : 36-24-37।

ট্যাক্সিটা ফ্লাইওভারের উপর উঠছে। বাঁয়ে : অবনমহল। ওঁর বাড়ি আর মিনিট পাঁচ-সাত। হঠাৎ কল্যাণের কথা মনে পড়ে গেল ওঁর। কল্যাণ সেনগুপ্ত। ওঁর ছাত্র। দিল্লীতে পোস্টেড। আই. পি. এস.। পুলিসের এক বড়কর্তা। পত্রিকাটা কল্যাণকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এটা তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার আবশ্যিক অঙ্গ। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এ জাতীয় অনাচার বন্ধ করা। এ তো নল্‌চের আড়াল দিয়ে পতিতাবৃত্তির বিজ্ঞপ্তি। কল্যাণ যা ভাল বোঝে করবে।





ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে প্রথমেই গেলেন ছট্রুলালের রিপেয়ার-শপে। ওঁর দ্বিতল ভদ্রাসনের বিপরীতে। রিপেয়ার-শপে ছট্রুলাল চাবির গোছা হস্তান্তরিত করে বললে, গাড়ি আপকা গ্যারেজমে ঘুস্ দিয়া।

মানিব্যাগটা বার করতে করতে প্রশ্ন করেন, কী গড়বড় হয়েছিল ?

—কুছ নেহি, প্রফেসার সাব। কার্বুরেটারমে থোড়া....নেহি, নেহি, কুছু নেহি দেনা হ্যয়....

ছট্রুলালের বড় ছেলেটি ওঁরই সুপারিশে ওঁর এক ছাত্রের অফিসে কর্ম-সংস্থান করেছে। 'কুছু লিখাপড়ি' শিখেছে কিনা, তাই গ্যারেজে কালিঝুলি মাখতে রাজি নয়। প্রফেসার-সা'বের দয়ায় সে নোক্‌রি জুটিয়ে নিয়েছে। তাই ছোটখাটো মেরামতির জন্যে প্রফেসার-সাহেবের কাছে ছট্রুলাল হাত পাততে নারাজ।

উনি একটা বিশ টাকার নোট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, নাও, ধর। এটা তোমার মজুরি নয়। শিউশরণকে মিঠাই খেতে দিচ্ছি আমি।

শিউ হচ্ছে ছট্রুলালের নাবালক বাচ্চাটা।

ছট্রুলাল হাত বাড়িয়ে নোটখানা গ্রহণ করে। কপালে ঠেকায়। মুখে বলে, ঈ-কোথা বোল্‌নেসে ম্যয় তো নাচার !

ডক্টর রঞ্জন তালুকদার এ-পাড়ায় দীর্ঘদিন আছেন। সবাই চেনে। শ্রদ্ধা করে। পণ্ডিত মানুষ হিসাবে। লেখক হিসাবে। চিররুগ্ণা পত্নীর একনিষ্ঠ সচ্চরিত্র স্বামী হিসাবে। রাস্তাটা পার হয়ে উনি নিজের বাড়ির 'কল-বেল' বাজালেন। ভিতর থেকে ভিয়ু-ফাইন্ডারে সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখে নিয়ে দরজা খুলে দিল রামু, ওঁর কম্বাইন্ড হ্যান্ড। বছর তের-চৌদ্দ। চট্‌পটে। ছট্‌ফটে।

—মাকে কম্‌প্ল্যান বানিয়ে দিয়েছিলি ?

—জী হাঁ। —হাত বাড়িয়ে ফোলিও ব্যাগটা নিতে যায়।

অভ্যাসবশে ব্যাগটা হস্তান্তরিত করতে গিয়ে হঠাৎ থমকে থেমে যান। পত্রিকাখানা ট্যাক্সিতে ফেলে আসেননি। ফোলিও-ব্যাগটা চাবিবন্ধ করা নেই। রামুর অবশ্য অক্ষর

পরিচয় নেই ; কিন্তু প্রায়-বিবস্ত্রা একটি রমণীর দেহসৌন্দর্য পাঠের জন্য অক্ষর-পরিচয় আবশ্যিক নয়।

বলেন, না রে। খাতা আছে।

রামু জানে, ব্যাগে খাতা থাকলে সেটা ছুঁতে নেই। 'খাতা' মানে কোন ছাত্রের রিসার্চ-পেপার। অথবা পরীক্ষার খাতা। সে সময় রামুর ব্যাগ ছোঁয়া মানা। সাহেব নিজে হাতে ঐ 'খাতা' সর্বাগ্রে তাঁর ড্রয়ারে বা আলমারিতে ভরে অন্য কাজে মন দেবেন। ব্যাগটা নিয়ে উনি বৈঠকখানায় ঢুকলেন। এটা ওঁর স্টাডিরুমও বটে। আলমারিতে সচরাচর রাখেন রিসার্চ-পেপার। আজ কিন্তু উনি আলমারি খুললেন না। স্টিল-টেবিলের টানা-ড্রয়ারে পত্রিকাখানা ঢুকিয়ে চাবি দিলেন। প্রয়োজন ছিল না। রামু কখনো ওঁর ড্রয়ার খোলার চেষ্টা করবে না। আর প্রণতি তো উত্থানশক্তি-রহিতা। তবু সাবধানের মার নেই।

কলেজের জুতো-জামা খুলে শয়নকক্ষে আসতেই প্রণতি বলেন, ট্যাক্সি করে ফিরলে যে ? গাড়ির কী হল ?

—গণ্ডগোল করছিল। ছট্টু মেরামত করে দিয়েছে।

কথা বলতে বলতে বিছানার পিছন দিকে চলে যান। দৃষ্টির আড়ালে সেখানে টুলের উপর রাখা আছে ইউরিনাল পটটা। ওটা তুলে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যান। নিত্যকর্মপদ্ধতি। অতি দীর্ঘ দিন। প্রণতি কতবার বলেছেন এ জন্য জমাদারকেই কিছু বাড়তি দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে। গৃহকর্তা সম্মত হননি। শয়নকক্ষে তিনি জমাদারকে ঢুকতে দেবেন না, কিছুতেই না। জাতপাতের কুসংস্কারে নয়, তিনি বিশ্বাস করেন নিজের 'ক্রুশ' যতটা সম্ভব নিজেকেই বইতে হয়। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সেটা হয়তো শতকরা শতভাগ সম্ভবপর নয়। তাই ঐ 'যতটা সম্ভব'। জমাদারদেরই বা কেন জানাবেন যে, ওঁর জীবনসঙ্গিনী উত্থানশক্তি-রহিতা। সেটা ওঁর দাম্পত্যজীবনের অন্তরালের কাহিনী।

ফিরে এসে টুলের উপর পাত্রটা রেখে বসে পড়েন ইজিচেয়ারে। বলেন, বইটা শেষ হয়েছে ? লাইব্রেরির বইটা ?

—না ! কিন্তু এ অসময়ে পরীক্ষার খাতা নিয়ে এলে কোথা থেকে ? না কি কারও রিসার্চ-পেপার ?

উফ্ ! আর তো পারা যায় না।

রামুটি একটি বিচ্ছু। প্রণতির ইনফর্মার ! পান থেকে চুনটুকু খসবার উপায় নেই। মায়ের কানে কানে বলে আসবে। না হলে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে প্রণতির জানার কথা নয় যে, উনি ট্যাক্সি করে ফিরেছেন। অথবা ওঁর ব্যাগে আজ 'খাতা' আছে। তবে এ নিয়ে মনে ক্ষোভ রাখা অন্যায়। কী সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে প্রণতির পৃথিবী ! এটুকু

কৌতূহলও যদি বজায় না থাকে তাহলে ও বাঁচবে কী নিয়ে ?

—কী হল, বললে না ? পরীক্ষার খাতা, না রিসার্চ পেপার ?

গলার স্বরটা নামিয়ে স্রেফ মিথ্যা কথাই বললেন, আরে না ! খাতা-ফাতা কিছু নয়। ক্যাশ টাকা আছে। কলেজ ফান্ডের। সে আমি তুলে রেখে এসেছি।

না, এটা মিথ্যা নয়, মনু বলেছেন, শত্রু ও ধর্মপত্নীর কাছে মিথ্যা বলায় পাপ হয়না—সে জন্যও নয়। এটা 'সত্য' এ-কারণে যে, এ 'শিব' ও 'সুন্দরের' অনুষঙ্গ।

রামু ইতিমধ্যে খাবারের প্লেট নিয়ে ঢোকে।

বৈকালিক ভোগই হবার কথা, তবে আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রামু দু-কাপ চাও নামিয়ে রাখে। প্রণতি বিকালে চায়ের সঙ্গে আর কিছু খান না। সহ্য হয় না। আর অধ্যাপক-মশাই শুধু বৈকালিক আহারটুকুই নয়, প্রত্যহ লাঞ্চ এবং ডিনার সারেন এ ঘরে। স্ত্রীর সান্নিধ্যে।

সেও আজ কয়েক দশক।

টি. ভি. প্রোগ্রাম শুরু হল। প্রণতির মুখস্থ। কোন বারে কী সিরিয়াল। এই সান্ধ্য অবকাশটুকু যাপনের মধ্যে তবু কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। লোড-শেডিং হলেও অসুবিধা নেই। বিজ্ঞানের অধ্যাপক মশাই ইনভার্টার বসিয়ে দিয়েছেন। যেদিন টি. ভি.-তে 'অখাদ্য' প্রোগ্রাম হয়—আর বাঙলা সিরিয়াল তো অধিকাংশই তাই—সেদিন শুরু হয় ভি. ডি. ও. সিনেমা। রামু আর চাঁদুর মা দুজনেই তা চালাতে জানে। রামু অথবা চাঁদু পাড়ার ভি. ডি. ও. পার্লার থেকে লিস্ট মিলিয়ে ক্যাসেট নিয়ে আসে, ফেরত দেয়। হিন্দিই বেশি। ডক্টর তালুকদারের কাছে এসব আউট অব বাউন্ডস্। 'ওয়ার্ল্ড দিস্ উইক' অথবা ভাল ইংরেজি সিরিয়াল না হলে তিনি তখন নেমে যান স্টাডিরুমে।

যেমন আজ। প্রয়োজন ছিল না। তবু ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে ড্রয়ারটা টেনে খুললেন। আবার একবার পড়লেন H.D.31-এর বিজ্ঞপ্তি। অস্বীকার করতে পারেন না—দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছে ব্যাপারটা জানতে। কী চায় মেয়েটা ? ডিভোর্সি— ফলে আশা করা অন্যায় হবে না যে, সে নতুন জীবনসাথী চায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঐভাবে কোনো মেয়ে কায়দা করে জানিয়ে দিতে পারে নিজের 'ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স্' ? বক্ষ-কটি-নিতম্বের বেড় ?

কিন্তু এমনও হতে পরে মেয়েটি 'আলট্রা-মডার্ন' ! সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীকে জানাতে চায় যে, একটি স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন ঘর করলেও সে তার ফিগারকে হারিয়ে ফেলেনি। তার যৌন-আকর্ষণ অবিকৃত।

অথবা যা উনি আশঙ্কা করছেন : H.D. 31 একটি 'কলগ্যের্ল', উচ্চকোটির বারবিলাসিনী। সে-কথা মনে হয়েছে বলেই পত্রিকাখানা সঙ্গে করে এনেছেন, ট্যাক্সিতেই ফেলে আসেননি।

ইচ্ছা, এটা কল্যাণকে পাঠিয়ে দিয়ে তদন্ত করে দেখতে বলবেন।

কিন্তু কল্যাণকে পত্রিকাখানা পাঠিয়ে দেবার আগে একটু যাচাই করে দেখে নেওয়া কি উচিত হবে না? উনি যা অনুমান করছেন, আশঙ্কা করছেন, তা যদি না হয়, ও যদি সত্যিই এক দুঃসাহসিকা পত্রবন্ধুত্বের প্রার্থিনী হয়? শুধু মেয়েটার কাছে নয়, কল্যাণের কাছেও তাহলে অপ্রস্তুতের একশেষ হতে হবে। মুখে বলবে না, কল্যাণ হয়তো মনে মনে বলবে, স্যারের মনের মধ্যেই আছে 'পাপ', আর তাই একটি অতি-আধুনিকা একান্তচারিণী মহিলার পত্রমিতালীর নিষ্পাপ কামনাকে উনি একটা কুৎসিত চিন্তায় মণ্ডিত করে দেখছেন।

হবে না? ওঁর নিজের যৌনজীবনই যে......

নাঃ! একটা এসপার্-ওস্পার করতে হবে!

বন্ড-কাগজের বাণ্ডিল রাখাই থাকে দেরাজে। উপন্যাস লেখার উপকরণ। তা থেকে একটা শাদা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন,

'সুচরিতাসু,

'পত্রমিতালী' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় তোমার বিজ্ঞপ্তিটি পড়লাম। জানি না, ইতিমধ্যে তুমি আর কারও মিত্রাণী হয়ে গেছ কি না। অবশ্য তা না হলেও আমার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে—যদি আমার এক নম্বর অনুমানটা ঠিক হয়। প্রধান অসুবিধা এই যে, আমি বিবাহিত। তাছাড়া আমি বয়সে তোমার দ্বিগুণ না হলেও দ্বিগুণের কাছাকাছি। কিন্তু আমার এক নম্বর অনুমানটাই কি নির্ভুল? জীবনসঙ্গী তো চাইছ না তুমি, চাইছ : পত্রমিতালী।

ফুলের যা দিলে হবে নাকো ক্ষতি, অথচ আমার লাভ
আমি চাই সেই সৌরভ শুধু, অতনু-অতল ভাব।
ঘাঁটিতে না চাই দুনিয়ার মাটি
তারই মাঝে মিশে রয়েছে যা খাঁটি
আমি চাই সেই পরশমণির চুম্বিত সোনাটুক্,
যাহা দিলে তার কোন ক্ষতি নাই, আমার ভরিবে বুক॥

হয়তো আমার এই দ্বিতীয় অনুমানটাই নির্ভুল। সেক্ষেত্রে আমি উৎসাহী। কেন বলি। আমি লেখক। কবি। ঔপন্যাসিক। নামে চিনবে না। কারণ আমি লিখি ছদ্মনামে। তুমি যদি আমাকে একটা নতুন ধরনের উপন্যাসের প্লট দিতে পার তাহলে যথাযোগ্য সম্মানদক্ষিণা দিতে আমি স্বীকৃত।

আমি জানতে চাই : কেন? কেন? কেন?

আমার প্রথম অনুমানটি যদি সঠিক হয়, এবং দ্বিতীয়টি ভ্রান্ত তাহলে জবাব দিও না আদৌ। খামটা ছিঁড়ে ফেল।

ইতি—তোমার কল্যাণকামী

সলিল মিত্র।"

ঠিকানা নির্ভুলই দেওয়া থাকল।

ও যদি আদৌ জবাব দেয়, তাহলে তা এসে পৌঁছবে এই দ্বিতল বাড়ির একমাত্র লেটার-বক্সে। তার চাবি ওঁর কাছে থাকে। দু-একবার চিঠি গোলমাল হওয়ার পর ইদানীং লেটার-বক্সের চাবি রামুকে দেন না। 'সলিল মিত্র, কেয়ার অফ প্রফেসর আর তালুকদার' লেখার প্রয়োজন নেই। বীট-পিওন ঠিকানা অনুযায়ী ঐ লেটার-বক্সেই চিঠিখানা ফেলে যাবে।





সাতটা দিন যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল তারপর। কাজটা কি ঠিক হল? হাতের লেখাটা ওঁর, ঠিকানা ওঁর বাড়ির। কিন্তু এ নিয়ে কেই বা যাচ্ছে তদন্ত করতে? হয়তো H.D. 31 আদৌ জবাব দেবে না। তাঁর এক নম্বর অনুমানটি যদি সত্য হয় অর্থাৎ ডিভোর্সি মেয়েটি যদি নতুন করে জীবনসঙ্গীর সন্ধানে পত্রমিতালীর পথ বেছে নিয়ে থাকে। আশা করছে অসংখ্য চিঠি পাবে। তার ভিতর বেছে নিয়ে চার-পাঁচটি স্যুটারকে জবাব দেবে। যারা চাকুরে, সুদর্শন, প্রায়-চল্লিশ। ডিভোর্সি হলেও ক্ষতি নেই, যদি না আগের আহাম্মকির একটি বোঝা কাঁধে চাপিয়ে থাকে।

অবশ্য ডিভোর্স-কেসে সে ঝামেলা স্ত্রীকেই সচরাচর পোহাতে হয়। কর্তা 'যথাবিহিত কাঞ্চনমূল্যেই' সচরাচর প্রায়শ্চিত্তটা করে থাকে।

আচ্ছা, ওর নিজের একটি সন্তান নেই তো? ও তো নিজেই ডিভোর্সি।

তা ছাড়া H.D. মানে কি? 'হিন্দু ডিভোর্সি'? হ্যাঁ তাই। ঐ যে আজন্মকুমারী মেয়েটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, সে পার্ট-টাইম টাইপিস্ট, বয়স বত্রিশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি—তার নম্বর H.U. 51—অর্থাৎ 'হিন্দু আনম্যারেড'।

পত্রমিতালীর সম্পাদকমশাই দেখা যাচ্ছে বিচক্ষণ ব্যক্তি। 'প্রজাপতি মার্কা' দপ্তর খোলেননি, কিন্তু মূল কারবারটা ঐ দিকেই ঝুঁকেছে। তাই ক্রমিক সংখ্যাগুলি যে-জাতের বিশেষণে বিভূষিত, সেগুলি জাতপাত এবং 'ম্যারিট্যাল স্ট্যাটাস'-এর দ্যোতক।

যাক সে কথা, যে কথা ভাবছিলেন। ঐ H.D. 31-এর কথা। দু চারটি পত্রবিনিময়ের পরেই মেয়েটা জানতে পারবে—কে কেরানি, কে গেজেটেড অফিসার। কার বুড়ি-মা ব্যাটার-বৌয়ের সেবার প্রত্যাশায় বেতো ঠ্যাঙ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে এবং কার নির্ঝঞ্ঝাটের সংসার। পত্রালাপের অবকাশে জেনে নেওয়া যাবে কী কী হবি, পড়াশুনা কতদূর, গাড়ি-বাড়ি আছে কি না। নিদেন নিজস্ব ফ্ল্যাট। তারপর কায়দা করে জেনে নিতে হবে : প্রথমপক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর হেতুটা কী? সে কি বাথরুমে গায়ে

কিন্তু হয়তো ওঁর এক নম্বর অনুমানটি ভুল। বিবাহের বন্ধনে ও নিজেকে বাঁধতে চাইছে না আদৌ। চাকরি করছে, একলা থাকছে, সিনেমা-থিয়েটার-জলসা-রেস্তোরাঁ, দিব্যি ফুর্তিফার্তা করছে। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। কর্তার বাক্যবাণে বিদ্ধ হতে হয় না, ওর বান্ধবীর দিকে সে কী দৃষ্টিতে তাকায় তা নজর করতে হয় না, মায় ওর শার্টে বোতাম লাগাবার পরিশ্রমটুকুও সইতে হয় না।

কিন্তু !

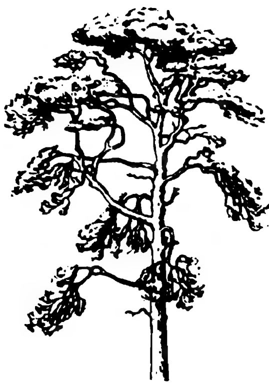
হ্যাঁ, একটা বিশেষ চাহিদা ওর পক্ষে মেটানো মুশকিল। আবশ্যিক জৈবিক চাহিদা। এই পুরুষশাসিত সমাজে। উইমেন্স লিব্-এর ধ্বজাধারিণীরা চাকুরিক্ষেত্রে বৈসাম্য রাখতে দেননি। 'পোস্টম্যান'কে 'পোস্টওম্যান' এবং 'চেয়ারম্যান'কে 'চেয়ারপার্সন' করে ছেড়েছেন। কিন্তু হাসপাতালে 'মেটার্নিটি ওয়ার্ডের' পাশাপাশি 'পেটার্নিটি ওয়ার্ড' খুলিয়ে দজ্জাল স্বামীর গর্ভসঞ্চারের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তেমনি 'সোনাগাছি'র পাল্লা দেওয়া 'হীরেগাছি পট্টি' শহরপ্রান্তে খোলাতে পারেননি। কনফার্মড ব্যাচিলার প্রৌঢ় বয়সেও আইন-সম্মতভাবে দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে আসতে পারে প্রস-কোয়ার্টার্সে ; চার অঙ্কের উপার্জনক্ষমা কুমারী, ডিভোর্সি বা বিধবার কোনো বিকল্প আয়োজন নেই। ক্যালক্যাটা কর্পোরেশনের 'চেয়ারম্যান'কে উৎখাত করে কোন জাঁদরেল 'চেয়ারওম্যান' গদী দখল করলেও সে সুযোগ মহিলাদের দিতে পারবেন না, এই একদেশদর্শী পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায়

হয়তো সেই হেতুতেই H.D. 31 পত্রমিতালীর প্রত্যাশী।

কিন্তু 36-24-37 !!

নিশ্চয় সংখ্যাতত্ত্বে গোঁজামিল আছে কিছুটা !





আট দিনের মাথায় এল চিঠিখানা।

কলেজ থেকে ফেরার পথে লেটার-বক্সে নজরে পড়ল খামটা। ওঁর নিজের হস্তাক্ষরে লেখা সলিল মিত্রের নামাঙ্কিত লেফাফা। সেটা বার করতে করতে পিছন থেকে রামু জানালো, মামাবাবু এসেছেন।

যাদুকর যেভাবে হাতসাফাই করে তেমনি দ্রুতগতিতে চিঠিখানা উনি লুকিয়ে ফেললেন পাঞ্জাবির পাশ-পকেটে। জানতে চাইলেন, মামাবাবু কোথায়? প্রত্যাশিত জবাবই পেলেন : মাজির কামরায়।

জগদীশ প্রণতির চেয়ে বছরতিনেকের ছোট। সপ্তাহে অন্তত একবার অফিসফের্তা গল্পগাছা করে যায়। এখানেই চা-খাবার খেয়ে সন্ধ্যা ঘনালে বাড়ি ফেরে। তখন বাসের ভিড়ও কমে যায়। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে অসীমা আর তোতনকে নিয়ে আসে। সেদিন দুপুরে এখানেই আহারাদি করে। সেই দিনগুলি প্রণতির ভারি আনন্দের। স্তব্ধ বাড়িটা একদিনের জন্য মুখর হয়ে ওঠে। আগে সেসব দিনে চাঁদুর মায়ের মুখখানা হাঁড়িপানা হত। এখন হয় না। প্রণতি কায়দাটা শিখে ফেলেছে। বলে, চাঁদুর জন্য একটা মাছ, আর একবাটি পায়েস নিয়ে যেও চাঁদুর্মা।

তালুকদার এ ঘরে এসে দেখলেন রামু মামাবাবুকে চা-জলখাবার দিয়ে ইতিপূর্বেই যথারীতি আপ্যায়ন করেছে।

জগদীশ চায়ের কাপটা নামিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত।

তালুকদার বললেন, ধূমপানের বিরুদ্ধে এত এত প্রচার, তবুও ঐ বদভ্যাসটা কেন ছাড়তে পার না—বল তো জগু?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জগদীশ বললেন, এন-এথ্‌বার কথাটা বললে জামাইবাবু, 'হোয়্যার এন টেন্ডস্ টু ইনফিনিটি'! এন্ মাইনাস-ওয়ানেথ্‌বার তোমাকে বলেছি যে, তোমার এ উপদেশ পৌনঃপুনিকতা দোষে অতিদুষ্ট। তবু তুমি বদভ্যাসটা কেন ছাড়তে পার না বলত? তুমি বরং আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও দিকিন?

—কী?

—'সলিল মিত্র' ব্যক্তিটি কে ?

যেন রিফ্লেক্স অ্যাক্শন !

প্রত্যুত্তর ঠোঁটের আগায় : আমার এক প্রাক্তন ছাত্র। কেন ?

শুধু তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিই নয়, ওঁর 'আই কিউ' ফেনমেনাল। প্রশ্নমাত্র কম্পুটারের দ্রুততায় বুঝে নিলেন : জগদীশ অহেতুক কৌতূহলে লেটার-বক্সে উঁকি মেরে দেখেছে, বাড়ির ভিতরে আসার আগে। কাচের ভিতর দিয়ে নামটা যে পড়া যাচ্ছিল তা অনুমাননির্ভর নয়, স্বচক্ষে দেখা।

বললেন, কেন সলিলকে কী দরকার ?

—না, তাই জিজ্ঞেস করছি। লেটার-বক্সে দেখলাম কিনা—অচেনা নাম।

অধ্যাপক তালুকদার অন্যমনস্কতার অভিনয় করে পাঞ্জাবির পাশ-পকেট থেকে লেফাফাখানা বার করে দেখে আবার পকেটেই রাখলেন।

বললেন, বেচারি থাকে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে। চিঠি ডেলিভারি হতে দেরী হয়। তাই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাবার পর আমাকে বলেছে.... যাক সে কথা। তোতনরা কেমন আছে ?

'খেজুরে-গল্প' কিছুটা চালিয়ে গা ধোওয়ার অছিলায় ঢুকে গেলেন বাথরুমে।

কিন্তু এ কী ?

খামের গর্ভে রয়েছে তাঁর নিজেরই লেখা চিঠিখানা ! অর্থাৎ যে চিঠি লিখেছেন সলিল মিত্র H.D. 31-কে।

তার অর্থ ? চিঠিখানা ও ফেরত দিল কেন ?

রুদ্ধদ্বার স্নানকক্ষে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত। তীক্ষ্ণবুদ্ধির পণ্ডিতটি কোনো কার্যকারণ-সূত্রের সন্ধান পেলেন না। ও যদি যোগাযোগ করতে না চায়—তা তো নাই চাইতে পারে—উনি বিবাহিত, প্রৌঢ়—কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটির পক্ষে স্বাভাবিক হত খামটা ছিঁড়ে ফেলা। অথবা বাস্তববুদ্ধি প্রখর হলে সাবধানে 'সেলফ্ অ্যাড্রেসড্' খামের অব্যবহৃত ডাক-টিকিটটা জলে ভিজিয়ে খুলে নেবার পর খামটা ছিঁড়ে ফেলা।

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল। উল্টোপিঠটা দেখলেন।

তাই বল। একই কাগজের বিপরীতপ্রান্তে গোটা গোটা মেয়েলি হরফে লেখা :

"কবিবরেষু,

"অহোবত ! কী সৌভাগ্য ! একে সাহিত্যিক, তায় কবি ! তুমি আমার বিজ্ঞপ্তি-বসনের খাঁজে খাঁজে এক নম্বর, দু-নম্বর কী অনুমানের খোঁজ করেছ তার আমি কী বুঝব ? লেখক হিসাবে তোমার জানা উচিত : এই বিশ্বপ্রপঞ্চের আধখানা কে বানিয়েছে তা আমরা জানি না, কিন্তু বাকি আধখানার সৃষ্টিকর্তা আমরাই— 'আপন

মনের মাধুরী মিশায়ে...'

"কৌতূহল যদি পুরোপুরি মিটে গিয়ে থাকে তাহলে এই কাগজখানার দাহকার্য সম্পন্ন কর—দুজনের হস্তাক্ষরেরই সহমরণে সদগতি লাভ হবে। সেজন্যই তোমার চিঠির উল্টোদিকে এই বিপরীত-বিহার। আর কৌতূহলের ছিঁটেফোঁটা যদি এখনো বাকি থাকে তাহলে নিচের নম্বরে রিং করতে পার। উপন্যাসের ভাল প্লটই পাবে। গ্যারান্টিড। তোমার প্রকাশক তোমাকে কী হারে রয়্যালটি দেন আমার জানা নেই কিন্তু আমি কি আমার 'প্রকাশক'-এর কাছে বিনামূল্যে বিকাবো ? তাতেও রাজি—যদি কবি কালিদাসের শর্তটা মেনে নাও। অর্থাৎ যদি প্রকাশের আগে আমিই হই তোমার পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা।

ইতি—

মালিনী।"

সন্দেহ দোলায়-দোলায় দোলায়মানা কুয়াশার যে রহস্যময় আবরণ একটা ছিল, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তা।

না, H.D. 31—হ্যাঁ তাই, 'মালিনী' ওর নাম নয়, কায়দা করে ছদ্মনাম নেওয়া, কাব্য করে—যেহেতু, কবি কালিদাসের নামে প্রচলিত গল্পে তাঁর প্রথম শ্রোতার নাম : মালিনী।

মোট কথা মেয়েটি জীবনসঙ্গী খুঁজছে না আদৌ।

সহজ, সরল, ভদ্র ভাষায়: 'রূপোপজীবিনী'।

হয়তো 'পত্রমিতালী'র সম্পাদক জানেন, অথবা জানেন না, আন্দাজ করেন—আপত্তি করেন না।

কিন্তু ঐ মেয়েটি—ঐ জাতের পাঁচজন 'অড্-উইমেন আউট'ই—'পত্রমিতালী' পত্রিকাকে দেহবিজ্ঞপ্তির উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছে। জীবনসঙ্গীর সন্ধানী হলে 'বিবাহিত প্রৌঢ়' মানুষটাকে সে আদৌ পাত্তা দিত না।

কিন্তু যদি সত্যিই ও পত্রবন্ধুত্বের অভিলাষী হয় ? না, তা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে নিজের 'ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স' ওভাবে বিজ্ঞাপিত করত না।

তাছাড়া ওর চিঠির খাঁজে খাঁজেও যে যৌন ইঙ্গিত ! 'প্রকাশক' কথাটাতে 'সিঙ্গল কোট' মার্ক দিয়ে বিশেষ ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছে ! চিঠির কাগজের উল্টো দিকে লেখাটাকে বলেছে : 'বিপরীত-বিহার'। এবার সিঙ্গল-কোট দেয়নি। অর্থাৎ সরলার্থই গ্রাহ্য : বিপরীত প্রান্তে ভ্রমণ।

মানছেন, সব মানছেন, তবু নিজের কাছে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, মেয়েটি 'সাধারণী' নয়, রাজনটীরা যেমন চৌষট্টি কলার মধ্যে বিশেষ করে শিখত পত্ররচনা, জাপানের 'গেইসা'রা যেমন বাক্যের টানাপোড়েনে একটা কুহকীমায়া

রচনায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা, ও-ও যেন তাই। আর সেজন্যই 'বিকোবার' আগে 'মূল্যের' প্রশ্নটা কায়দা করে তুলেছে। 'মূল্য' অথাৎ 'অর্থমূল্য'। কিন্তু সেজন্য কি ওকে দোষ দেওয়া যায় ? সলিল মিত্র তো নিজে থেকেই বলেছিলেন, মনোমত একটা গল্পের প্লট পেলে ওকে যথাযোগ্য 'সম্মানদক্ষিণা' দেবেন। এক্ষেত্রে 'ফিজ' আর 'সম্মানদক্ষিণার' ফারাক কী ? দুটোই তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের প্রতিশ্রুতির পরিমাপের মূল্যায়নে।

তবে হ্যাঁ, চিঠি শেষ করার আগে সে আরও একটি প্রস্তাব দিয়েছে। অর্থাৎ যদি তাকে কবি কালিদাসের মালিনী হবার অধিকার দেওয়া যায়। যদি সলিল মিত্র উপন্যাসটি লিখে প্রকাশক বা পূজা সংখ্যার সম্পাদকের হাতে তুলে দেবার আগে পাণ্ডুলিপিটি ওকে সর্বপ্রথম পড়তে দেন !

এ কথা ও কেন বলল ? ও তো সলিল মিত্রের কোনো লেখা পড়েনি। 'মালিনী' যেমন ছদ্মনাম, এ-তরফের 'সলিল মিত্র'ও তো তাই।

তাহলে ? প্রথম দর্শনে প্রেম হয়। বাস্তবে হোক না হোক, রোমিও জুলিয়েটে হয় ! তাই বলে প্রথম পত্রপাঠে প্রেম ! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, স্যার ?

কালিদাসের 'মালিনী' সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি ? সেটাও তো কল্পকথা।

কবি বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রমে কাব্য রচনা করতেন—শকুন্তলা, কুমারসম্ভবম্, মেঘদূতম্—আর ঘোর-ঘোর প্রাগূষা লগ্নে রাজার প্রাসাদে ফুল-জোগানোর পথে থমকে থেমে যেত মালিনী, এসে বসত ওঁর সদর দরজার সামনে। পাখির কূজন তখনো জাগেনি বনদেবীর শাখায় শাখায়। বলত, পড়ুন, আর্যপুত্র, কাল রাত্রে কাহিনী কোন পথে মোড় নিল ?

কালিদাস শুকতারাকে সাক্ষী রেখে সেই ঘৃতপ্রদীপ-জ্বলা আধো-অন্ধকারে আবৃত্তি করে শোনাতেন সদ্য রচিত দশ-বিশটি শ্লোক।

হয়তো বা তা রতিরঙ্গরসের অকপট বর্ণনা।

দেহদর্পণে দেহাতীতের প্রতিচ্ছায়া।

ইতিহাস বলেনি, লাজে-রাঙা মালিনী মাঝপথে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিল কিনা—ক্ষান্ত হন আর্যপুত্র ! এ বর্ণনা স্বয়ংপাঠ্য, আবৃত্তির যোগ্য নয়। অন্তত, ঘৃতপ্রদীপজ্বলা জনান্তিকে—

ইতিহাসে একথাও বলেনি, প্রত্যুত্তরে কবি কালিদাস ফুৎকারে ঘৃতপ্রদীপ শিখাকে নির্বাপিত করে প্রায়ান্ধকারে কামোদ্দীপিতা মালিনীর 'লজ্জাহারণ' করেছিলেন কিনা।

তাছাড়া ইতিহাস এ কথাও বলেনি যে, কবিপত্নী কক্ষান্তরে নিদ্রাগতা।

তিনি দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘতর রাত্রি শয্যালীনা—রতিরঙ্গসুখবঞ্চিতা।

জানবার যেটুকু ছিল জেনেছেন, কিন্তু তাই বলে কৌতূহল কি ফুরিয়ে গেছে ?

এমন আমন্ত্রণ পাওয়ার পর ? —কবি কালিদাসের ভাষায়—যাকে বলে 'বিবৃত জঘনাং কো বিহাতুম্ সমর্থঃ ?'

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন।

—হ্যালো ? ...ইয়েস স্পিকিং ! হুম্ ড্যু য়ু ওয়ান্ট প্লীজ ?

তালুকদার ইংরেজিতে বললেন, 'মালিনী' নামে একটি মেয়ে...

—ডিয়ার মি ! কবি ! বলুন কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি ? হ্যাঁ, আমি মালিনীই বলছি।

—তুমি আমাকে একটি প্লট দিতে প্রতিশ্রুত...

—শুধু প্লট ? বেণীর সঙ্গে মাথা দিতেও যে প্রস্তুত ! 'তোমারে যা পারিব না দিতে সে কার্পণ্য চিরকাল আমারেই রহিবে বঞ্চিতে'! বল, কবি ! কবে, কখন শুভাগমন ঘটবে ?

—কত দূরে ? কোথায় যেতে হবে ?

অল্প কথায় ঠিকানা আর পথনির্দেশ জানিয়ে দিল। 'মেঘচুম্বিত অ্যাপার্টমেন্টস্' দক্ষিণ কলকাতাতে। বেশি দূরে নয় যোধপুর পার্ক থেকে। সদ্যনির্মিত অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। সব ফ্লাটে এখনও কোয়াপারেটিভ মেম্বারদের শুভাগমন ঘটেনি। ওর ফ্ল্যাট নং এইট/টোয়েন্টি। অর্থাৎ আটতলায় বিশ নম্বর দরজা। লিফট্ আছে। স্বয়ংক্রিয়। সর্বদা চলন্ত। লোড-শেডিং-নির্ভর নয়। 'পশ' এলাকা।

—এবার বল কখন আসছ ? কবে ?

—শুভস্য শীঘ্রং। ধর কাল।

—সরি ! কাল সন্ধ্যায় আমি এনগেজড্।

—সন্ধ্যায় নয়। দুপুরে। দুটোয় 'অফ' হচ্ছি, ধর আড়াইটেয়। তাহলে ?

—তুমি কি কলেজে পড়াও ?

অসাবধানে কথাটা বলে ফেলেছেন। তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি মালিনী ?

—অল রাইট ! অল রাইট ! প্রফেসর সলিল মিত্র। বেলা দুটোয় যখন তুমি 'অফ' হচ্ছ, তখন আড়াইটেতেই—অ্যাসুমিং তুমি 'দমদম মতিঝিল' বা বি. টি. রোডের 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিট্যুটে' 'অফ্' হচ্ছ না ! তাহলে আধঘণ্টাই যথেষ্ট, দুপুরবেলা।

—ডোর-বেল বাজালে যে সাড়া দেবে তাকে কী বলব ? 'মালিনীকে' ডেকে দিতে ?

—ঠিক দুটো ত্রিশে হলে আমি নিজেই দোর খুলে দেব।

—আর যানজটে যদি পৌনে তিনটে বেজে যায় ?

—দেখবে, খোলা দরজায় দুটি কপাট দুহাতে ধরে মালিনী পনেরো মিনিট অধীর আগ্রহে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে, আর্যপুত্রের প্রতীক্ষায়।

এ কী হল ? এ কী হচ্ছে ? তিন কুড়ি পার্ডি দেবার ব্রাহ্মমুহূর্তে এ কোন জাতের ধাষ্টামো ? নল্চের আড়ালটা কার দৃষ্টিপথে দিচ্ছেন ? নিজের বিবেক ? পূজা-সংখ্যার জন্য একটা নভেলেটের প্লট অনুসন্ধানে এই জাতের অভিসার ? ন্যাকামির একটা সীমা থাকবে তো ?

কিন্তু তেলাপোকার টানে মোহগ্রস্ত কাচপোকার মতো, উনি যেন চলেছেন নিয়তি-নির্দিষ্ট সর্বনাশের পথে। পরিচয় জানতে আর কিছু বাকি নেই। আলট্রা-মডার্ন সফিস্টিকেটেড কল-গ্যের্ল। মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে খদ্দের 'বসায়'। একবার শয্যাসঙ্গিনী হবার দক্ষিণামূল্য কত ? কিন্তু উনি তো মেয়েটিকে স্পর্শমাত্র করবেন না ?

উনি তো শুধু জানতে চান—কেন ? কেন ? কেন ?

ত্রিশ বছর বয়স, একশ ছেষট্টি সে. মি. উচ্চতা। ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স : 36-24-37, ডিভোর্সি এবং চাকুরিজীবী এসবই শোনা কথা—হেয়ার-সে। কিন্তু মেয়েটি কথাবার্তা, পত্ররচনায় তো যাকে বলে, 'এ-ওয়ান'। টেলিফোনে ইংরেজিতে সামান্যই আলাপচারি হয়েছে, কিন্তু তার ভিতরেই মনে হয়েছে, মেয়েটি কনভেন্ট-লালিতা। এমন একটি সর্বগুণান্বিতা রমণীরত্ন কী হেতুতে বেছে নিল এই জীবিকা ? কেন সে কারও সহধর্মিণী নয়, কেন সে নয় কারও 'মা' ? দেশকে, দশকে, আগামী প্রজন্মকে সে কী দিয়ে যাচ্ছে ? শুধুই ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার রিরংসা-পুরীষ ?

—কেন ? —কেন ? —কেন ?





পরদিন গাড়ি নিয়ে কলেজে এলেন না। উনি চান না, ঐ 'মেঘচুম্বিত অ্যাপার্টমেন্ট' হাউসের সামনে রাস্তার উপর গাড়িটা পার্ক করতে। কলেজ থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যখন ওখানে পৌঁছলেন তখনও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়নি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে উঠে এলেন আটতলায়। অধিকাংশ ফ্ল্যাটই খালি। বস্তুত, মিস্ত্রিরা এখনও কাজ করছে এখানে-ওখানে। নিচে অবশ্য তক্‌মাধারী দারোয়ান বসে ছিল। চোখ তুলেও দেখল না।

এইট/টোয়েন্টি নম্বরচিহ্নিত দরজা। একটা নেমপ্লেট : এস সোন্ধী।

কল-বেল বাজাতে গিয়ে ইতস্তত করলেন কিছুটা। মিনিটতিনেক। তার ভিতর একবার মাত্র লিফটটা উপর থেকে নিচে নামল। একজোড়া চড়ুই পাখি রেলিঙে এসে বসে বিহঙ্গভাষে নিজেদের মধ্যে কী-যেন বলাবলি করল। এ-ছাড়া চরাচর নিস্তব্ধ। মনেই হচ্ছে না, এটা জনাকীর্ণ কলকাতা শহর।

প্রফেসর তালুকদার মরিয়া হয়ে কল-বেলটার গলা টিপে ধরলেন।

তৎক্ষণাৎ ম্যাজিক্-আইয়ের ও প্রান্তে এগিয়ে এল একটা কৌতূহলী চোখ।

সে চোখে কাজল-পরা আছে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু ভারি পাল্লাটা পাঁচ সেন্টিমিটার আন্দাজ ফাঁক হল। তারপর আটকে গেল সেফ্‌টি ক্যাচ-এ।

ও-প্রান্ত থেকে বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হল : হুম ডু য়্যু ওয়ান্ট প্লিজ ?

—মালিনী, মালিনী সোন্ধী ! ডাজ শি লিভ হিয়ার ?

—ইয়েস অ্যান্ড নো। বাট হুম্ শ্যুড আই অ্যানাউন্স ?

—মিত্র। এস. মিত্র।

দরজাটা খুলে গেল : 'একী, আর্যপুত্র যে !'

উনি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ইয়েল-লক সদর দরজা এবং করিডোরে জ্বলে উঠল জোরালো বাতি।

অসতর্ক অধ্যাপকের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল : আপনি ?

মেয়েটি—মহিলাটিই বলা উচিত—চলতে শুরু করেছিল। এ কথায় থমকে থেমে গিয়ে বললে, তুমি কি ট্রিলজি লিখবে বলে মনস্থির করে ফেলেছ?

—ট্রিলজি! মানে?

—প্রথম খণ্ডে নায়িকা 'আপনি', দ্বিতীয় খণ্ডে 'তুমি', তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে আজকাল তোমাদের কলেজে ছেলে-মেয়েরা যা করে : 'তুই-তোকারি'!

—আমি কলেজে পড়াই কে বলল?

—কে আবার? তুমি! এস! এখানে দাঁড়িয়ে কথা কইলে বাইরের প্যাসেজে শুনতে পাওয়া যায়। তা হঠাৎ 'আপনি' বলে থেমে গেলে যে? তুমি কি আগে আমাকে কোথাও দেখেছ?

চলতে চলতে ওঁরা এসে বসলেন ড্রইংরুমে। প্রকাণ্ড ঘর, কিন্তু ভালভাবে সাজানো নয়। ড্রইংরুমটা বড়, বেশ বড়, কিন্তু সোফা-সেটি কিছু নেই। খানকয় ফোল্ডিং চেয়ার। একটা ক্যানভাসের ইজিচেয়ার। দেওয়ালে ছবি, ক্যালেন্ডার একটাও নেই। মায় সিলিঙে ফ্যান পর্যন্ত নেই। অথচ দেওয়ালে সিন্থেটিক এনামেলের মোলায়েম প্রলেপের কুহক।

—কী দেখছ?

—এমন সুন্দর ফ্ল্যাট, অথচ এমন ন্যাড়া কেন?

—ডির্ভোসের সময় মানি-সেট্‌লমেন্টে ফ্ল্যাটটা পেয়েছি, ফার্নিচার নয়। ধীরে ধীরে কিনতে হবে। কিন্তু তুমি আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দাওনি। তুমি কি আমাকে আগে কোথাও দেখেছ?

—বাস্তবে নয়। ফটোতে। 'পত্রমিতালী'র প্রচ্ছদে। থার্ড ইস্যুতে।

—আই সি। হ্যাঁ, ওটা আমারই ছবি। কিছু খাবে?

—খাব? এই বেলা আড়াইটার সময়? আমার বয়সটা কত তা তো আমি বলেছি, মিসেস্ সোন্ধী।

—আমি মিসেস সোন্ধী নই। তুমি আমাকে 'মালিনী' বলেই ডেক। আর 'খাবে' প্রশ্নটা রিডিক্লাস মনে হচ্ছে, যেহেতু হিন্দি বা ইংরেজির মতো ঐ ক্রিয়াপদের চলিত বাঙলা নেই। লাইক টু হ্যাভ আ ড্রিংক? এত গরমে এলে তো, তাই বলছি। জিন অ্যান্ড লাইম? দেব একটা?

—নো, থ্যাংস। আমি মদ্যপান করি না।

—গুড হেভেন্স! 'জিন' মদ নয় গো, সাহিত্যিক মশাই। আপনার প্রফেশনাল ছদ্মনামটা কী দয়া করে জানাবেন? 'জিন'কে যিনি মদ বলেন, তিনি কী জাতের কথাসাহিত্যে রচনা করতে সক্ষম, আমি জানতে কৌতূহলী।

—আমার কথা থাক। তোমার কথা শুনতে এসেছি। সন্ধ্যায় তোমার

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ফলে ঘণ্টা-তিনেক তোমার সঙ্গে আলাপচারি করলে কী পরিমাণ সম্মান-দক্ষিণা দিতে হবে সেটা সর্বাগ্রে জেনে নিতে চাই।

—আলাপচারি ?

—হ্যাঁ, তাই। তুমি 'বেণীর সঙ্গে মাথাটাও' দিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমি শুধু বেণীটুকুই সংগ্রহ করতে এসেছি। আই ওয়ান্ট য়োর স্টোরি, অ্যান্ড নাথিং বাট ইট !

—'ওনলি-বিমল'-স্টোরি ?

এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, অঙ্কটা 'ভেরিএবল্'। বাড়ে-কমে। সেটা নির্ভর করে পার্টির স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শানের উপর !

—স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শান ? সন্তুষ্টি ?

—তাই বলেছি আমি। তুমি নাকি মাথা বাদ দিয়ে শুধু বেণীটুকু নিতে এসেছ। তা সেই বেণীটা দিয়ে তোমাকে স্যাটিস্‌ফাই করতে হবে না ? আরও সহজ ভাষায় : তুমি এসেছ একটা প্লটের সন্ধানে—জানতে যে, যৌনপত্রিকায় যে মেয়েটি মডেল হতে রাজি, সে কেন কারও ঘরণী নয়, সে কেন নয় কারো 'মা' ? তাই তো ?

—একজ্যাক্টলি। কেন ? কেন ? কেন ?

—সেই কিস্‌সা শুনিয়ে তোমাকে স্যাটিস্‌ফাই করতে হবে প্রথমে। তুমি না পারে বলতে পার—এ তো জানা প্লট, মোপাসাঁ, টুর্গেনিভ বা ব্যালজাকে পড়েছি।

অধ্যাপক তালুকদার একটু ঝুঁকে বসেন সামনের দিকে : জাস্ট আ মিনিট। তোমার পড়াশুনাটা কদ্দুর ?

—নাউ য়ু আর টকিং, প্রফেসর ! পড়াশুনা ! অব এ প্রস্টিট্যুট ! ! হ্যঃ !

—ঠিক আছে। পড়াশুনার কথা থাক। তোমাদের বিবাহিত জীবন কতদিনের ?

—লেস দ্যান আ ইয়ার। কেন ? সে কথা কেন ?

—মাত্র এক বছর ! প্রেম করে বিয়ে !

মেয়েটি দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বলল, ওসব কথা থাক— লেটস্ গো ট্যু দ্য বেডরুম। ওখানে ফ্যান আছে। ড্রিংস যখন করবেই না।

—কী দরকার ? আমার তো গরম লাগছে না ?

—আমার লাগছে।

—একটা হাত-পাখাটাখা নিয়ে এস তাহলে।

ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল দেড় মুহূর্ত ! তারপর বললে, বাট হোয়াই ? প্রস্ কোয়ার্টার্সে আসতে পারলে, আর তার বেডরুমে গেলেই জাত যাবে ?

—'জাত যাবে' তা তো আমি বলিনি।

—বলনি, বাট য়ু আর বিহেভিং..ওয়েল, আমি গা গেকে ব্লাউজটা খুললে তুমি

মূর্ছা যাবে না তো ? সত্যিই আমার এখানে গরম লাগছে....

প্রফেসর তালুকদার হেসে ফেলেন।

বলেন, না মালিনী ! তুমি গা থেকে ব্লাউজটা খুললে আমি মূর্ছা যাব না। ইন ফ্যাক্ট, ঐ অবস্থাতেই তো তুমি ফটোটা তুলিয়েছিলে, তাই নয় ?...ঐ পত্রিকায় ?...দেখে আমি তো মূর্ছা যাইনি....

মেয়েটি দুম্ দুম্ করে উঠে গেল বেডরুমে। প্রফেসর তালুকদার অন্যমনস্কের মতো পাশের টি-পয়ে রাখা একটা ফটো-অ্যালবাম তুলে নিলেন। পাতা উলটেই বুঝতে পারলেন, সেটা বিশেষ উদ্দেশ্যে ওখানে অবিন্যস্তভাবে সুবিন্যস্ত। ফটো-অ্যালবামে মেয়েটির একাধিক আলোকচিত্র। নানান মাপের। ও নিশ্চয় কোনো ফটোগ্রাফারের মডেল।

পত্রিকায় তবু নল্চের আড়াল ছিল। এখানে একাধিক ন্যূড-ফটোগ্রাফ। 'খদ্দের'কে ওয়র্ম-আপ করার অ্যাপিটাইজার।

নিঃশব্দে অ্যালবামটা স্বস্থানে নামিয়ে রাখলেন।

ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন হল, সরবতে আপত্তি আছে ? লিমন্ স্কোয়াশ ? নাকি আমার ছোঁওয়া খাওয়া যাবে না ?

তালুকদার বেডরুমের দিকে মুখ করে নেপথ্যচারিণীকে বললেন, তুমি অহেতুক আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ, মালিনী। নিয়ে এস। লিমন-স্কোয়াশ নয়, 'জিন-উইথ্ লাইম স্কোয়াশ'। দু পাত্রই এনো। তুমিও খাও নিশ্চয় ?

একটু পরে শয়নকক্ষের পর্দা সরিয়ে মালিনী এ ঘরে এল। তার দুহাতে কাচের গ্লাস। উপরে বরফের কিউব। শুধু ব্লাউস নয়, অধোবাসটিও সে ঘরের ভিতর খুলে রেখে এসেছে।

একটা গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে সে মুখোমুখি বসে বললে, এই যে বললে 'মদ্যপান' কর না !

—গুড হেভেন্স ! 'জিন' মদ নয় গো, জনপদকল্যাণী ! আপনার প্রফেশনাল ছদ্মনামটা কী, দয়া করে জানাবেন ? 'জিন'কে যিনি 'মদ' বলেন, তিনি কী-জাতের রতিরঙ্গকুহক রচনা করতে সক্ষম, আমি জানতে কৌতূহলী !

—দ্যাটস্ এ গুড ওয়ান ! জিন আগে কখনো পান করেছ ?

—করিনি ! ইতিপূর্বে কোনো জনপদকল্যাণীর প্রমোদভবনে...বাই দ্য ওয়ে...'জনপদকল্যাণী' কাকে বলে জান তো ?

ওর হাতের গ্লাসে গ্লাসটা ঠেকিয়ে বললে, চিয়ার্স ! জানি।

একটা চুমুক দিয়ে প্রফেসর তালুকদারের মনে হল, ও গুল মারছে। প্রশ্ন করেন, অজন্তা-গুহায় একটি জনপদকল্যাণীর ছবি আছে, কোথায় তা জান ?

—জানি। কেভ্ সিক্সটিন। সব গাইড বইতে যাকে ভুল করে লেখে 'দ্য ডাইং প্রিন্সেস'। মেয়েটি রাজনন্দিনী আদৌ নয়। আমারই মতো জনপদকল্যাণী।

রীতিমতো অবাক হলেন অধ্যাপক তালুকদার। মেয়েটির পড়াশুনার রেঞ্জটা জানা নেই। কিন্তু ও সেই জাতের উত্তরাধিকার বহন করছে, প্রাচীন গ্রীসে যাদের বলত 'হেটেরা', প্রাচীন ভারতে 'রাজনর্তকী'।

আর এক সিপ্ পান করলেন। জিন আগে কখনও পান করেননি।

স্বাদটা ভালই লাগছে। একটু কড়া! বোধহয় এক গ্লাসে ডবল্-পেগ দিয়েছে।

দুজনেই নিঃশব্দে পান করতে থাকেন।

তারপর মালিনী বললে, এবার তোমাকে তোমারই অস্ত্রে বধ করব অধ্যাপক! বল তো, বৌদ্ধযুগে একজন অযোনিসম্ভবা জনপদকল্যাণী সে-কালীন শ্রেষ্ঠ ভেষগাচার্যকে গর্ভে ধারণ করে....

তালুকদার ওকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না। তাঁর বাঁহাতে ধরা ছিল পানপাত্রটা, ডান হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলেন ওর গজদন্তশুভ্র বাহুমূল। উত্তেজিতভাবে। বলে ওঠেন, তুমিও কি তা পার না কল্যাণী? সেই অযোনিসম্ভবা জীবকমাতা আম্রপালীর মতো? এই তিনশ বছরের বুড়ি কলকাতা-শহরের ট্রামরাস্তার উপর দাঁড়িয়ে সমকালকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে শাশ্বত আম্রপালীর মতো উদাত্ত নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা করতে: প্রভু বুদ্ধ লাগি, আমি ভিক্ষা মাগি.....

মেয়েটি হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল।

ওর চোখজোড়া আর্দ্র হয়ে উঠল। যে-হাত ওর বাহুমূল ধরে আছে তার উপর একটি হাত আলতো করে চাপা দিয়ে বললে, আমার গর্ভেও এসেছিল জীবক! জানলে? কিন্তু কী করব? তথাগত তো কোনদিনই এসে পদধূলি দিলেন না এই আম্রপালীর সর্বতোভদ্রে! তেমন করে কেউ যে আমার কানে কানে বীজমন্ত্রটা...

ঘরের টেবিল-ল্যাম্পটা বার-দুই দপ্‌দপ্ করে জ্বলে কী-যেন ইঙ্গিত করে নিভল।

তালুকদার বলেন, লোড-শেডিং হল নাকি?

মেয়েটি ভ্রূক্ষেপ করল না। বলে, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে, অধ্যাপক?

বেশ নেশা হয়েছে। ঘরটা দুলছে।

তালুকদার বললেন, কী জানতে চাও? জিজ্ঞেস করে দেখ.....

গ্লাসের তলানিটুকুও গলায় ঢেলে দিলেন।

মালিনী উঠে গেল বেডরুম-এ। শূন্য পান-পাত্র দুটি নিয়ে।

ফিরে এল একটু পরেই। পূর্ণপাত্র হাতে। নির্দ্বিধায় একটি পাত্র গ্রহণ করলেন তালুকদার। ওঁর মনে পড়ল না, কোথায় বসে আছেন, মনে পড়ল না বাড়ি ফেরার কথা, অথবা 'অ্যালকোহল'-এর প্রতিক্রিয়া আগে কখনো উপভোগ করেননি। আবার

এক চুমুক পান করে বললেন, কী জানতে চাইছিলে, আম্রপালী ?

—তুমি লিখেছিলে যে, তুমি বিবাহিত। মিসেস মিত্র কি জানেন যে, তুমি আম্রপালীর প্রমোদভবনে আজ এসেছ স্পর্শ-বাঁচানো পূজা সংখ্যার প্লটের সন্ধানে ?

একটু থমকে গেলেন উনি। প্রণতির প্রসঙ্গ উঠে পড়তে পারে এটা বোধহয় আন্দাজ করেননি। একটু গম্ভীর স্বরে বললেন, না ! সে হতভাগিনী কিছুই জানে না। আর, স্পর্শ তো বাঁচেনি, আমি তোমার বাহুমূল চেপে ধরেছি কামোন্মত্ত না হলেও উত্তেজিত হয়ে...

—আমি তো তোমার ঠিকানা জানিই। আমি যদি গিয়ে তাঁকে বলে আসি ?

ধীরে ধীরে মেয়েটির বাহুমূল ছেড়ে দিলেন। শয্যালীন একটি প্রৌঢ়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওঁর। বললেন, খুব সম্ভবত তুমি তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবে না। এ তাঁর চিন্তার বাইরে ! দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবন আমাদের ! কিন্তু যদি কোনভাবে তুমি অকাট্য প্রমাণ দাখিল করতে পার, তাহলে সে মর্মান্তিক আহত হবে। হয়তো মরে যাবে ! ইয়েস ! মরেই যাবে !

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে প্রগলভা রূপোপজীবিনী। ওরও বেশ নেশা হয়েছে এতক্ষণে।

বলে, মরে যাবে ? অ্যাক্কেরে মরে যাবে ? হিংসেয় ? বুক ফেটে ? যাঃ !

সোজা হয়ে বসলেন প্রফেসর তালুকদার।

পানপাত্রটা নামিয়ে রাখলেন টুলে।

এই প্রথম বিচলিতবোধ করলেন উনি। মনে হল, কাজটা ঠিক হয়নি, ঠিক হচ্ছে না ! এ জাতীয় আলোচনা উঠে পড়তে পারে, তা আন্দাজ করেননি।

গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, তাই ! কথাটার ঠিক বাংলা নেই, তাই তোমার কাছে 'রিডিক্লাস' মনে হচ্ছে ! কিন্তু লিটারালি 'বুক ফেটে'ই মরে যাবে সে ! আসলে ওর হার্ট খুব দুর্বল। প্রেশার খুব হাই ! ও...ও একজন 'ইনভ্যালিড'...ক্রিপ্‌ল্‌ড্‌ ! চিররুগ্না। বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারে না। আমি পাঁজা-কোলা করে নিয়ে যাই...

বেদনার্দ্র হয়ে উঠল প্রগলভার মুখ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। জানতে চাইল, কতদিন ? কতদিন উনি শয্যাশায়ী ?

তালুকদার ওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বললেন, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্যের অদ্ভুত মিল !

—মানে ?

—আমার বিবাহিত জীবনও—'বায়োলজিকাল' অর্থে বলছি—এক বছর। তারপর একটা অ্যাকসিডেন্টে...

—তার মানে বলতে চান বিশ-পঁচিশ বছর ধরে আপনি...

—আঠাশ বছর। কিন্তু হঠাৎ 'আপনি' কেন? ট্রিলজি লিখবে নাকি?

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ে।

এবার চেয়ারে নয়। ওঁর সামনে, মেঝেতে। দু-হাতে ওঁর হাটু-জোড়া জড়িয়ে ধরে বলে, আয়াম সরি! রিয়েলি সরি!

—য়ু নিড্‌ন্ট বি! তোমার দুঃখিত হবার কী আছে?

—ওঁর অসুস্থতা নিয়ে আমি রসিকতা করেছি, ব্যঙ্গ করেছি—

—কিন্তু তখন তো তুমি সব কথা জানতে না।

ওঁর কোলে মাথাটা রাখল। বন্ধনীমুক্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসের যুগল পেলব স্পর্শ অনুভব করলেন জানুতে। সংযতস্বরে বললেন, চেয়ারে উঠে বস, আম্রপালী!

—বসছি। তার আগে একটা কথা বলুন...আপনি কি, মানে এই দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে...

—হ্যাঁ, তাই! বেণীর সঙ্গে মাথা দিতে চেয়েছিলে তুমি; আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু জিন-উইথ-লাইমের মতো সে 'আনন্দ' অনাস্বাদিতপূর্ব নয় আমার কাছে! আঠাশ বছর আগে...

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, কিন্তু কেন? পাপ-পুণ্য মান বলে?

—না, আম্রপালী—আমি বৈজ্ঞানিক! পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক আমাদের মানতে নেই!

—আর ঈশ্বর?

—ঈশ্বর ওয়াজ আউট অব্ বাউন্ডস্ ঈভন টু দ্য লর্ড বুদ্ধা, জীবকমাতা!

—তাহলে কেন? কেন এই তিন দশকের ব্রহ্মচর্য? পার্সোনাল এথিক্স?

মাথা ঝাঁকি দিয়ে প্রৌঢ় মানুষটি বলে ওঠেন, আমার কথা থাক আম্রপালী। আমি জানতে এসেছি তোমার কথা। সেই কথা বল। লুক হিয়ার! আমি মহামানব তথাগত নই। জনপদবধূ আম্রপালীকে রাতারাতি বৌদ্ধ-ভিক্ষুণীতে রূপান্তরিতা করার ক্ষমতা আমার নেই। বাট্...বাট্...আমি সাহিত্যিক...আমি কথাশিল্পী...আমি কবি। সমাজের কাছে আমি দায়বদ্ধ...'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর, তার পরে ছুটি নিব'! এই কণ্টাকাকীর্ণ সমাজে ঐটুকুই আমার দায়িত্ব। শুধু দু-একটি কাঁটা...আই মাস্ট নো, কেন তোমার মতো একটি রমণীরত্ন...

মেয়েটি কী একটা কথা বলতে চায়। উনি হাত বাড়িয়ে তার মুখটা চাপা দিলেন। বলেন, আমার বলা শেষ হয়নি আম্রপালী! আমি যেমন গৌতম বুদ্ধও নই, তেমনি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিও নই। ঠিক জানি না, হয়তো আত্মপ্রতারণা! হয়তো শুধু সত্যের সন্ধানে নয়, সৌন্দর্যের সন্ধানেই আমি ছুটে এসেছিলাম—ঠিক যেমন করে দু'হাজার বছর আগে প্র্যাক্সিটেলেস্ ছুটে যেতেন ফ্রিনের কাছে...

বাহুবন্ধন মুক্ত করে নিজে থেকেই সরে যায় মেয়েটি।

বলে, 'ফ্রিনে' কে, আমি জানি না।

—'প্র্যাক্সিটেলেস্'কে জান ?

—না ! কোনো গ্রীক দার্শনিক ?

—না ! দার্শনিক নন। সমকালের তো বটেই, বোধকরি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। 'ভেনাস ডি মিলো' হয়তো তাঁরই কীর্তি। তিনি ভালবেসেছিলেন ফ্রিনেকে। ফ্রিনে, এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেটেরা, জনপদকল্যাণী ! অনাবৃতা ফ্রিনেকে মডেল করে একাধিক ভেনাস মূর্তি গড়েছিলেন প্র্যাক্সিটেলেস্। তার একটির পাদমূলে আজও খোদাই করা আছে গ্রীক ভাষায় শিল্পীর স্বীকৃতি, যার ইংরাজী অনুবাদ "Praxiteles hath portrayed to perfection the Passion (Eros), drawing his model from the depths of his own heart and dedicated Me to Phryne, as price of Me"

—ইংরেজিতে বলছ কেন ? আর কী বিদঘুটে ইংরেজি !

—হ্যাঁ, তার কারণ গ্রীকভাষা থেকে অনুবাদক আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন। তাও দু-তিনশ বছর আগে। চসার আর শেক্সপীয়ারের অন্তর্বর্তীকালে। আমি নিজেই একটা বাংলা অনুবাদের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু নিজেই তার অর্থ বুঝিনি।

মালিনী হাসল।

বলল, শুনি তোমার অনুবাদ ?

"—প্র্যাক্সিটেলেস তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে (দেহজ) কামনার অনিন্দিত ব্যঞ্জনাটি এখানে মূর্ত করেছেন, আর সেজন্যই আমাকে উৎসর্গ করে গেছেন ফ্রিনের উদ্দেশ্যে—সেইতো আমার মূল্য।"

—কিন্তু তা কি সম্ভব ? প্র্যাক্সিটেলেস্ কি 'ভেনাস'-এর সত্য-শিব-সৌন্দর্যের নাগাল পেয়েছিলেন ফ্রিনেকে অস্বীকার করে ? অপমান করে ?

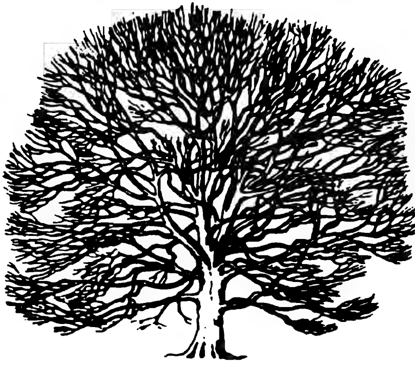
—অপমান করে ?

—নয় ? তুমি আমার নারীত্বকে অস্বীকার করছ, অপমান করছ ! তোমায় হৃদয় দিয়ে নয়, মানিব্যাগ থেকে আমার সম্মানমূল্য মেটাতে চাইছ ? এভাবে তো হয় না প্র্যাক্সিটেলেস ! Pay the price of Phryne ! ফ্রিনের নারীত্বের মর্যাদা যে তোমাকে সর্বাগ্রে মিটিয়ে দিতে হবে। অর্থ দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে।

ধীরে ধীরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন প্রৌঢ় অধ্যাপক তালুকদার+

বললেন, আয়াম সরি।

দুটি হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। সবলে বুকে টেনে নিলেন ওকে।



আরও সাতটা দিন কেটে গেছে তারপর।

আবছা মনে পড়ে অভিজ্ঞতাটা। ঘোর-ঘোর বিস্মৃতির একটা কুয়াশা জড়ানো। এল. এস. ডি. বা মারিজুয়ানা সেবনের স্বর্গসুখস্মৃতি যেন! মনে পড়ে, আচমকা ডোর-বেলটা আর্তনাদ করে উঠেছিল। তখন ওঁরা দুজনেই আদম-ঈভ! ঘরে সর্বক্ষণ একটা জোরালো বাতি জ্বলছিল। এত প্রখর আলো ওঁর ভাল লাগছিল না। মেয়েটি শোনেনি। বলেছিল, 'আমরা কি চুরি করছি'? ডোর-বেলটা আচমকা বেজে উঠতেই মেয়েটি হাত বাড়িয়ে চট করে নিবিয়ে দিল বাতিটা। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, পালাও! ও এসে গেছে!

—ও? ও কে?

—ডোন্ট আস্ক কোশ্চেনস্। নাও, পরে নাও।

অন্ধকারে ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ড্রয়ার, গেঞ্জি, প্যান্ট, শার্ট!

আবছা অন্ধকারে খানিকটা নিজে নিজে পরলেন, খানিকটা ও পরিয়ে দিল। 'জিন'-এর প্রভাব ততক্ষণে জম-জমাট!

—এস, আমার সঙ্গে এস।

কোথায়, তা জানতে চাননি। বেডরুমের সংলগ্ন টয়লেটে একটা ছোট একপাল্লার দরজা। বাইরের করিডোর থেকে জমাদারের আসার পথ। সেই দরজাটা খুলে ও বলল, বাঁ দিকে লিফ্ট্।

—আর তুমি?

—আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আই নো হ্যোয়ার আই স্ট্যান্ড!

তা বটে! এটা ফ্রিনের নিজস্ব সাম্রাজ্য!

কিন্তু 'ও' কে? সোন্ধী? তার সঙ্গে তো ওর ডির্ভোস হয়ে গেছে। ও তো নিজেই বলেছে, ও মিসেস সোন্ধী নয়!

ঠিক তখনই লিফ্ট্‌টা এসে দাঁড়ালো আট নম্বর ফ্লোরে। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে দ্বিতীয়

যাত্রী ছিল না। ফলে কেউ জানতে পারল না, ওঁর জামার বোতামগুলো ভুল ঘরে লাগানো।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনেই দাঁড়িয়েছিল একটা ট্যাক্সি। সৌভাগ্যই বলতে হবে। তখন ওঁর শারীরিক অবস্থা খুব জুতের নয়। যোধপুর পার্কে নিজস্ব বাড়ির নম্বরটা তা বলে ভুলে যাননি। ট্যাক্সি থেকে নেমে মানিব্যাগ খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে দিয়েছিলেন সে কথা মনে আছে। কিন্তু লোকটা ভাঙানি ফেরত দিয়েছিল কিনা সেটা মনে পড়ে না।

দিন-সাতেক পরে সাহসে ভর করে ফোন করলেন ওকে। রামু তখন বাজারে। প্রণতি অঘোরে নিদ্রায় অভিভূত। বার-দুয়েক রিঙিং টোনের পর ও-প্রান্তে সাড়া জাগল : ইয়েস, সোন্ধী স্পিকিং।

ইংরেজিতে বললেন, মালিনী আছে? একটু ডেকে দেবেন?

—হু?

—ডিয়ার মি! ওর নাম কি তাহলে মালিনী নয়? এটা 'এইট বাই টোয়েন্টি মেঘচুম্বিত অ্যাপার্টমেন্টস্' তো?

—দ্যাটস রাইট। কী নাম বললেন? মালিনী?

—নামটা ভুলও হতে পারে। আমি লিখে রাখিনি। বয়স প্রায় ত্রিশ।

—আ-ইয়েস! মাল্লিনী। তাই বলুন। ও বাথরুমে আছে। একটু লাইনটা ধরুন। কী নাম বলব? কে ফোন করছেন?

—মিত্র, সলিল মিত্র।

ওঁর স্পষ্ট মনে হল টেলিফোনের 'কথামুখে' হাত-চাপা দিয়ে ও-প্রান্তবাসী ইংরেজিতে উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'মালিনী তোমাকে টেলিফোনে সাম মিস্টার মিত্র খুঁজছেন। তোমার কি বাথরুম থেকে বার হতে দেরি হবে?'

তারপর একটু নীরবতা। বাথরুম থেকে কেউ কিছু বলল কি না বোঝা গেল না। অন্তত টেলিফোনে কোনো শব্দ ভেসে এল না। তারপর ভদ্রলোক টেলিফোনে বললেন, মালিনীর দেরী হবে বাথরুম থেকে বের হতে। ও রিং-ব্যাক করবে বলল! আপনার নম্বরটা কাইন্ডলি...

তালুকদার সর্তক হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যে।

বলেন, আমার বাড়িতে ফোন নেই। পোস্ট-অফিস থেকে ফোন করছি।

—আই সি! ধরুন!

আবার 'কথামুখে' হাত চাপা দিয়ে ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে কাকে যেন ইংরেজিতে বললেন, ওঁর ফোন নেই। কী বললে? অ্যাড্রেস? ও আচ্ছা...ঠিক আছে লিখে রাখছি...

এই কথাগুলি মাউথপিসে ফাঁকা-আঙুলে হাত চাপা দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলা হল। তারপর ও-প্রান্তবাসী বেশ সহজকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এক্সকিউজ মি, মিস্টার মিত্র, ও 'সলিল মিত্র'কে ঠিক প্লেস করতে পারছে না। আপনি কি বালিগঞ্জ থেকে বলছেন ? আপনার অ্যাড্রেসটা কাইন্ডলি...

অধ্যাপক তালুকদার নিঃশব্দে ধারক-অঙ্গে টেলিফোন যন্ত্রটা নামিয়ে রাখলেন। সাবধানী বুদ্ধিমান মানুষটির মনে হল সোন্ধী মায়াজাল বিস্তার করতে চাইছে। মালিনী মেয়েটির নাম নয়, হতে পারে না। কবি কালিদাসের প্রসঙ্গে কাব্য করে ও ছদ্মনাম নিয়েছিল : মালিনী। আর সেই জন্যই প্রথমবার ও-প্রান্তবাসী নাম শুনে চিনতে পারেনি। প্রতিপ্রশ্ন করেছিল : হু ?

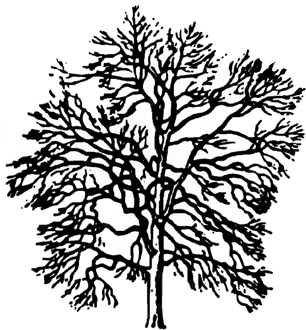
খুব সম্ভবত সোন্ধীর বাথরুমে কেউ ছিল না।

সে শূন্যে কথাগুলি ছেড়ে দিয়ে ওঁর বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করছিল। কায়দা করে ওঁর টেলিফোন নাম্বার অথবা ঠিকানাটা জানতে চাইছিল।

উপায় নেই। মেয়েটি নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে এ রহস্যজাল ছিন্ন করা যাবে না।

কিন্তু ওঁর গরজটাই বা কী ? একটা দুঃস্বপ্ন—আচ্ছা, না হয় 'সুখস্বপ্নই' হল—'স্বপ্ন' বলে অভিজ্ঞতাটাকে গ্রহণ করলে ক্ষতি কার ?





আরও দিন-তিনেক পরে ডাকবাক্স থেকে উদ্ধার করলেন একটা মোটা খাম। সলিল মিত্রের নামে। বেশ ভারী খাম। বাড়তি ডাক-টিকিট দিতে হয়েছে। ও বোধহয় অনেক কিছু লিখেছে। স্টাডিরুমে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে সযত্নে পেন-নাইফ দিয়ে খামটা খুলে ফেললেন।

ভিতর থেকে বার হয়ে এল খান-ছয়েক পোস্টকার্ড-সাইজ রঙিন হট-শট্ ফটোগ্রাফ !

বজ্রাহত হয়ে গেলেন অধ্যাপক তালুকদার !

ঐ ছয়খানি রঙিন আলোকচিত্র ব্যতিরেকে লেফাফার ভিতর আর কিছু ছিল না। প্রতিটিই চূড়ান্ত পর্নোগ্রাফিক আলোকচিত্র। নরনারীর নিরাবরণ যৌনমিলনের দৃশ্য। তিনখানি ছবিতে পুরুষটির পিছন দিক দেখা যাচ্ছে, সে তিনটিতে মালিনীকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। দু-খানি ছবিতে অধ্যাপক তালুকদারের সম্মুখদৃশ্য। চশমাটা খোলা আছে, তবু চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না, সে তিনটিতে রতিরঙ্গসঙ্গিনীর পশ্চাদ্দেশ দেখা যাচ্ছে। বাকি একখানি পাশ থেকে তোলা। প্রোফাইল। নায়ক-নায়িকা দু-জনকেই স্পষ্ট সনাক্ত করা যায়।

যা ছিল মধুর স্বপ্নময় আধোস্মরণে তা পুরীষক্লিন্নকদর্যতায় উপস্থিত হল চাক্ষুষভাবে। ভয় তো পেয়েছেন বটেই, ঐ সঙ্গে নিদারুণ একটা বেদনার অনুভব !

মেয়েটি এই ! মানুষ চিনতে পারলেন না ! সে তো একটা পয়সাও হাত পেতে নেয়নি। বলেছিল, তার দক্ষিণা ওঁর তৃপ্তির পরিমাণ-নির্ভর। পরে, হ্যাঁ শেষ পর্যায়ে যা বলেছিল তা অন্য দৃষ্টিভঙ্গির। ফ্রিনে তার নারীত্বের মর্যাদা দাবী করেছিল প্র্যাক্সিটেলেস্-এর কাছে। তাকে উপেক্ষা করে উনি ফিরে এলে নাকি ফ্রিনের শাশ্বত নারীত্বের অপমান ! কী সব বড় বড় কথা !

বাস্তবে—ছি, ছি, ছি ! ভারী পর্দার পেছনে হটশট ক্যামেরা হাতে প্রতীক্ষায় ছিল ওর পাপের সঙ্গী। তাই ঘরে অত জোরালো আলোর আয়োজন। হয়তো ফ্লাশবাল্‌বে

ঝিলিকও দিয়েছে—তখন নেশাগ্রস্ত প্রৌঢ় মানুষটি ছিলেন দীর্ঘ তিন দশকের তৃষ্ণায় কাতর। জৈবক্ষুধায় হতভাগ্য তখন তুরীয়ানন্দে অন্য জগতে। এসব জাগতিক কাণ্ডকারখানার উর্ধ্বে, বহু উর্ধ্বে!

ছি-ছি-ছি! এ কী হয়ে গেল!

জীবনে যিনি কখনো হার মানেননি—স্কুল-কলেজ জীবনে কখনো সেকেন্ড হননি, তিনি এভাবে চূড়ান্তভাবে হেরে গেলেন একটা বেশ্যা আর তার নাগরের ছলনায়! জীবনে এত বড় সমস্যার সম্মুখীন হননি কখনো। প্রণতির অ্যাকসিডেন্টের সময়েও এতটা বিচলিত হয়ে পড়েননি। সেবার মাথা খাড়া রেখেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফারটা ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার? ওরা তো অনতিবিলম্বেই ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে দেবে!

পরদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে শুনলেন, সারা দিন কে-একটা বেগানা লোক ওঁকে বারে বারে ফোন করেছে। নামটা জানায়নি, কিন্তু রামুকে বলেছে—তার সাহেব ফিরে এলে যেন জানানো হয়, রাত সাড়ে আটটায় সে আবার ফোন করবে। ব্যাপারটা নাকি খুবই জরুরী। সাহেব যেন রাত সাড়ে আটটায় বাড়িতে থাকেন।

প্রণতি বিরক্ত হয়ে বলেন, কে বল তো লোকটা? কী চায়? ভারি উদ্ধত মেজাজের। অসভ্য।

বুঝলেন সবই। মুখে বলতে হল, আমি কী করে জানব?

কাঁটায়-কাঁটায় আটটা উনত্রিশে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

উনি প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। পড়ার টেবিলে। বাঁ-হাতটা টেলিফোন রিসিভারে রেখে। ঘর ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। একবার মাত্র রিঙিং টোন হতেই তুলে নিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, ইয়েস! তালুকদার বলছি..

—আপনি কি প্রফেসর রঞ্জন তালুকদার আছেন?

পুরুষকণ্ঠ। বিকৃত কণ্ঠস্বর। উচ্চারণও বিকৃত। পশ্চিমা ঢঙে। হয়তো ইচ্ছাকৃত।

উনি ওর খাজা বাঙলার জবাবে বললেন, আছি।

—অ! আছেন! বাই মিসটেক প্রফেসর সলিল মিত্র আছেন না তো?

দাঁতে-দাঁত চেপে নীরব রইলেন। বঁড়শিতে মাছটা নিশ্চিত গেঁথেছে বুঝতে পেরে ও লোকটা ওঁকে একটু খেলিয়ে তুলতে চায়।

—কী হল, প্রফেসর-সাহেব? গুম খেয়ে যাচ্ছেন কেন? সুতো ছাড়লুম, অখন ঘাই মারুন। আর কুছু না পারেন তো শালা-বাহানচোৎ করুন।

—কী চাও তুমি?

—আপনাকে এক সেট পেরিস্-পিকচার প্রেজেন্ট পাঠিয়েসি। পাইয়েস্েন তো?

—কী নাম তোমার?

—প্রফেসর-সাহাব। আপনাকে একঠো প্রশ্ন করা হইয়েসে, জবাবটা পহিলে দিন! এতটা উমর হল, ই-কথা জানেন না কি, আসামী সির্ফ জবাব দিয়ে যায়, সওয়াল করে না? প্রফেসর তালুকদার, আপনি আপনার ল্যাংটো ছবি পাইয়েসেন?

উপায় নেই! সংক্ষেপে সারতে না পারলে ও ক্রমেই অশ্লীলতর আলাপচারি শুরু করবে। বললেন, পেয়েছি।

—বহুৎ সুক্রিয়া! অব শুনেন, স্যার। ছয়খানা ছবির তিন-তিন সেট প্রিন্ট করা হইয়েসে। একসেট আপনার প্রিন্সিপাল-সাহেবের খাতির, দুস্‌রা-সেট মিসেস্ তালুকদারের খাতির। সমঝলেন? অখন থার্ড সেট কুথায় যাবে আন্‌জাদ করতে পারেন?...কোই বাত নেই, থিংক করেন...

প্রফেসার তালুকদার অসীম ধৈর্যে নীরব রইলেন। লোকটা ওঁকে ভয় দেখাতে চাইছে। ভয় যে পাননি তা নয়, কিন্তু ভয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হতে দেবেন না কিছুতেই! হার মেনে নেওয়া ওঁর ধাতে নেই।

অবশ্য এমন নরকের কীটের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে নামবার দুর্ভাগ্য ওঁর আগে কখনো হয়নি জীবনে।

—টাইম খতম হইয়ে গেলো। আন্‌জাদ করতে সেক্‌লেন না। আপনার কলেজে ঘুস্‌তে একঠো বড়কা লুটিস্ বোর্ড আছে না? ঐ বোর্ড-এ ছয়খানি ফটো রাতারাতি লটকে দিয়ে আস্‌ব। প্রফেসররা সবাই দেখবে, ছেলেরা দেখবে, ওর ছুকরিগুলান ভি দেখবে। এখন বলুন স্যার, এ বে-ইজ্জতি বুখতে চান? ইয়েস্ অর নো?

—কত টাকা চাইছ?

স্পষ্ট উচ্চারণে বললে, নাউ য়ু আর টকিং প্রফেসর! সি্‌ধা হিস্‌াব! ইচ সেট ছবির দাম পাঁচ পাঁচ হাজার, ওর নেগেটিভ দ'স হাজার। অব হিসাব জুড়িয়ে লিন : তে-পাঁচা পন্দের ওর দ'স—পঁচি'স হাজার! লেকিন সবটা দস-বিস টাকার য়ুজ্‌ট্ নোটে! সমঝলেন?

লোকটা নিজেকে অবাঙালি, অশিক্ষিত উত্তরভারতের লোক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। বাস্তবে ও বাঙালী এবং শিক্ষিত। উনি টাকার অঙ্কটা জানতে চাওয়া মাত্র আনন্দে ওর ছদ্মবেশটা খণ্ডমুহূর্তের জন্য গা থেকে খুলে গেছিল। 'আন্দাজ'কে যে 'আন্‌জাদ' উচ্চারণ করে সে হঠাৎ-খুশিতে ঐ ইংরেজি লব্‌জ্‌টা কিছুতেই বলতে পারে না 'নাউ য়ু আর টকিং, প্রফেসর!' ইংরেজিতে অনেক ক্রাইম থ্রিলার ওর পড়া।

—কী হল প্রফেসর-সাব? ফিন গুম খেয়ে গেলেন নাকি?

—অত টাকা আমি কোথায় পাব?

—ই একটা কোথা হল? রাজারা মানিক পায় কুথায়?

আবার—আবার একটা ক্লু। 'কথা' কে 'কোথা', 'কোথায়'কে 'কুথায়' যার বাংলা

জ্ঞান, তার সঞ্চয়ে থাকা সম্ভবপর নয় ঐ বাঙলা ঘরোয়া রসিকতা 'রাজারা মানিক পায় কোথায়' ? লোকটা এক নিশ্বাসে বলেই চলেছে, ক্যাশ-সার্টিফিটি তোড়াতে পারেন, ইউনিট-ট্রাস্ট, এন. এস. সি. নিদেন প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে লোন। ভাবীজীর দু-চারখান অর্নামেন্টস্ ঝেড়ে দিলেই বা কে ঠেকাচ্ছে ? ভাবীজীর তো মালুম পড়বে না। ব্যাঙ্ক-ভল্ট তো আপনিই ট্রানস্যাক্ট করেন।

পাকা ক্রিমিনাল সন্দেহ নেই ; কিন্তু সূক্ষ্ম কারিগরী এখনো আয়ত্ত করতে পারেনি। মিসেস্ তালুকদার যে পঙ্গু,এ সংবাদ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে অথচ বুঝতে পারে না যে, একটা অর্ধশিক্ষিত মানুষ, যে 'সার্টিফিকেট'কে 'সার্টিফিটি' বলে, সে 'ব্যাঙ্ক-ভল্ট ট্র্যানস্যাক্ট' করার কথা বলতে পারে না ! সে দিলখুশ হলে ফস্ করে বলে বসতে পারে না : নাউ য়ু আর টকিং, প্রফেসর !

কাঁচা কাজ !

—কী হল ? কুছ্ তো বলেন ?

বুঝতে পারেন, এর সঙ্গে দরদাম চলবে না।

বললেন, একটা শর্তে আমি টাকাটা দেব।

—কী শর্ত ?

—টাকাটা আমি ঐ ঠিকানায় দেব। তোমার পার্টনার-ইন-ক্রাইম সেই মেয়েটির সামনে, সেই এইট বাই টোয়েন্টি...

—থামুন, থামুন ! টেলিফোনে ই-সব বাৎ বোলতে নেই। সে অ্যাপার্টমেন্ট অখন বেহাৎ ! তিন রোজ টাইম দিচ্ছি। আজ বুধবার আছে, শনিচর রাত সাড়ে-আট বাজে ফিন টেলিফোন করে জানাব কোথায়, কীভাবে প্যাকেটটা আপনি দিবেন। সমঝ্লেন ?

—শোন...

ও-প্রান্তবাসী শুনল না। রিসিভারে ফোনটা নামিয়ে রাখল। সম্ভবত ওর একটা আশঙ্কা আছে পুলিস ওকে খুঁজছে। ও কোথা থেকে ফোন করছে তা ধরবার চেষ্টা করতে পারে পুলিস। দীর্ঘসময় টেলিফোন-লাইনে থাকলে 'গোস্ট-কল' খুঁজে বার করা যায়—এ তত্ত্বটা ওর জানা। যতই অশিক্ষিত বলে নিজেকে জাহির করতে চাক ও বেশ ভালই শিক্ষিত। 'ব্ল্যাকমেলিং' যদি একটি অপরা-বিদ্যা হয় তাহলে সে সে-বিদ্যা ভালভাবেই আয়ত্তে এনেছে। শুধু আলাপচারিতায় অভ্যস্ত হয়নি। তাছাড়া ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি নেই। প্রফেসর তালুকদারের মতো মানুষকেও সে ফাঁদে ফেলতে পেরেছে।

অবশ্য সে কৃতিত্বের বৃকোদর-ভাগ সেই মেয়েটির প্রাপ্য ! যাঁকে ওর মনে হয়েছিল শুধু রতিরঙ্গরসেই নয়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, কৃষ্টিতে সে Phryne ! অমন একটি

মেয়েকে কী করে পার্টনার-ইন-ক্রাইম করতে সক্ষম হল এ লোকটা ? তা সে যাই হোক, ও নিশ্চয় এতক্ষণ কোনো পাবলিক টেলিফোন-বুথ থেকে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছে। জানে, পুলিস সেই উৎসমুখের সন্ধান পেলেও ওকে ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পাবে না। তাতেই একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা চালাতে ও গররাজি।

পুলিসে খবর দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কেউ ওঁকে ব্ল্যাকমেলিঙ করবার চেষ্টা করছে এ-জাতীয় এজাহার দেবার সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে—'কী নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং'। এভিডেন্স হিসাবে ঐ ছয়খানি ছবি তাঁকে দাখিল করতে হবে। লোকটা ধরা পড়লে মামলা আদালতে উঠবে। আসামী পক্ষের উকিল ছবিগুলি প্রকাশ্য আদালতে...

নাঃ। সে অসম্ভব। বস্তুত এটাই হচ্ছে 'ব্ল্যাকমেলিং বিজনেসের' বিউটি টাচ্ ! সারা বিশ্বে ব্ল্যাকমেলারদের হাতে অনিবার্যভাবে থাকে রঙের টেক্কাখানা। যতক্ষণ না সেটা টেবিলে নামানো হচ্ছে ততক্ষণ তাকে কেউ ছুঁতে পারে না। না ভিক্‌টিম, না পুলিস। সম্মান বাঁচাতে গিয়ে, অপরাধটা গোপন করতে গিয়ে, কেলেঙ্কারিটা বুখতে গিয়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। দশ-বিশ বছর আধপেটা খেয়ে, না-খেয়ে, হতভাগ্যের দল ব্ল্যাকমেলারকে টাকার যোগান দিয়ে চলে। উপায় নেই। ঐ রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারের খপ্পরে একবার পড়লে আমৃত্যু নিষ্কৃতি নেই! এটাই এ খেলার একপেশে নিষ্ঠুর নিয়ম !

কিন্তু প্রফেসর রঞ্জন তালুকদার যে জীবনে কখনো কারও কাছে হার মানেননি ! মর-মানুষের কাছে। প্রণতির দুর্ভাগ্যটা নিতান্ত নিয়তি। তবু সেবার মাথা খাড়া রেখেই ঈশ্বর-নিক্ষিপ্ত—ঈশ্বর বলে যদি আদৌ কোনো সত্তা থাকে—বজ্রটা বুক পেতে গ্রহণ করেছিলেন !

কিন্তু এবার ?

রাত্রে আহারের অবকাশে তালুকদার জানতে চাইলেন আজ টি. ভি. তে 'চিত্রহার' ছিল না ?

প্রণতি জানেন, এসব নিতান্ত 'খেজুরে-আলাপ'। অধ্যাপক মশায়ের ওসবে আদৌ কোনো আকর্ষণ নেই। এ শুধু আলাপ-জমানোর অহৈতুকী প্রয়াস। বললেন, সেই অভদ্র লোকটা ফোন করেছিল ? সাড়ে আটটায় ?

—করেছিল ! অভদ্র শুধু নয়, অসভ্য !

উনি মনগড়া এক দীর্ঘ কাহিনী শোনালেন। বিপদ কখন কীভাবে আসবে জানা নেই। লোকটা নানাভাবে ওঁর গৃহের শান্তি বিনষ্ট করবার চেষ্টা করতে পারে। ভয় দেখাতে। সেক্ষেত্রে প্রণতিকে একটু-একটু করে তৈরি করতে হবে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে কিছুটা প্রস্তুতি থাকলে অজ্ঞাত আঘাতের আকস্মিকতার ধার কিছুটা ভোঁতা

হয়ে যাবে। বড় জাতের শক্ ভাল নয় প্রণতির দুর্বল হৃদয়ের পক্ষে।

উনি যে গল্পটা ফাঁদলেন তাতে আছে এক ভিলেন। নানান পাপ কাজে সে হাত পাকিয়েছে। ওয়াগন ব্রেকার। ইলেকশনের সময় বুথ দখল করার বিনিময়ে রাজনৈতিক দলের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছে । পুলিস তাকে ছুঁতে সাহস পায় না। ভয় পায়, তাহলে তাকে পাণ্ডববর্জিত স্টেশানে বদলি করে দেওয়া হবে। এ হেন মন্ত্রীমহলের প্রিয়পাত্র যে গুন্ডা, তার একটি মাসতুত ভগিনী আছে। চোরে-চোরে সম্পর্ক অথবা সত্যিই মাসির মেয়ে, জানা নেই, তবে মেয়েটি পড়াশুনায় ভাল। নাম মালিনী। এবার সে নাকি ফার্স্ট-ইয়ারের পরীক্ষায় পাস করেনি। ফেল করেছে তালুকদার-সাহেবের পেপারেই। তাই ঐ মস্তান ওঁকে টেলিফোনে শাসাচ্ছে। বলছে, মেয়েটাকে পাস করিয়ে না দিলে...

ভয়ে নীল হয়ে যান প্রণতি, তুমি...তুমি কী করবে?

—আরে, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? এটা কলকাতা শহর!

—কলকাতা শহরে খুন-জখম হয় না? বিশেষ যদি প্রভাবশালী মন্ত্রী-টন্ত্রীর পোষা গুন্ডা হয়?

—তুমি ভেব না। যা ব্যবস্থা নেবার আমি নেব। পুলিসের টপ-লিস্টে কল্যাণ আছে। কল্যাণ সেনগুপ্ত। তুমি তো চেনই। আমার প্রিয় ছাত্র। ওকে একটা ফোন করে দেব। ও মস্তান পার্টিকে কড়কে দেবে।

পরদিন এল জগদীশের ফোন : জামাইবাবু, তোমার সেই ছাত্রটি লোক সুবিধের নয় কিন্তু...

—কোন ছাত্রটি?

—ঐ যে সুবল মিত্তির না সলিল মিত্তির। ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে থাকে বলে যে তোমার অ্যাড্রেসটার সুযোগ নেয়।

—তাই নাকি? তুমি কী করে জানলে?

—কাল একটা মিস্টিরিয়াস টেলিফোন পেয়েছি। বুঝলে? প্রথমে আমার নামটা জেনে নিয়ে লোকটা জানতে চাইল তুমি আমার ভগিনীপতি কি না। স্বীকার করায় বললে, তোমার এক ছাত্র কিংবা 'কোলীগ' সলিল মিত্র একটা মেয়ের সঙ্গে লটঘট করছে। মানে, 'ইল্‌লিসিট্ কানেকশন'। মেয়েটার নাম মালিনী। ওর মামাতো বোন। ও আমাকে বলেছে তোমাকে অনুরোধ করতে, যেন সলিল মিত্র মালিনীর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয়।

—'ব্যাপারটা' মানে?

—পরিষ্কার করে বলেনি। হয় 'মানি-সেট্‌লমেন্ট' অথবা বিয়ে করা। ঠিক বোঝা

গেল না।

—আই সী ! কথা শুনে তোমার কি মনে হল ও লোকটা লেখাপড়া জানা বাঙালী...

—আদৌ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও পশ্চিমা মুসলমান। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। ভাঙা-ভাঙা বাঙলা বলতে পারে মাত্র...

—বুঝলাম। তুমি আমাকে দুটো শব্দ শুনিয়েছ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। একটা 'লটঘট' একটা 'ইল্‌লিসিট্‌ কনেকশন'। ও নিজে কোনটা ব্যবহার করেছিল, জগু ? ঐ মিস্টিরিয়াস লোকটা ?

—কেন বল তো, রঞ্জনদা ?

—তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী লোকটা ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলতে পারে। ফলে 'লটঘট' শব্দটা সে ব্যবহার করবে না। কথিত বাংলায় যার যথেষ্ট দখল তার পক্ষেই শব্দটা ব্যবহার্য। আবার পড়াশুনায় যে অষ্টরম্ভা তার পক্ষে 'ইল্‌লিসিট্‌ কনেকশন' শব্দের প্রয়োগ...

—তাই তো ! আমার যতদূর মনে পড়ে ও 'ইল্‌লিসিট্‌ কনেকশন' শব্দটাই ব্যবহার করেছে।

—তাহলে পড়াশুনায় সে অষ্টরম্ভা নয়। কেমন ? কী নাম বলেছে ?

—বললে তো 'মাস্তান'। আমার বিশ্বাস হয় না। বাবা-মা কোনো সদ্যোজাত সন্তানের নাম 'মাস্তান' রাখতে পারে ?

—পারে, যদি 'মাস্তানির' সহজাত কবচ-কুণ্ডল নিয়ে সে মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে। যা হোক, তুমি চিন্তা কর না, আমি সলিলকে জিগ্যেস করে যথোচিত ব্যবস্থা করব।

সেদিন কলেজেও এক কাণ্ড হল।

প্রিন্সিপাল-সাহেব তাঁর চেম্বারে ওঁকে ডেকে পাঠালেন। কলেজ সংক্রান্ত এ-কথা সে-কথার আলাপ আলোচনা হল কিছুটা। ইউ. জি. সি-র গ্রান্ট, কেমিস্ট্রি ল্যাবের এক্সপ্যানশন ইত্যাদি। তারপর সৌজন্যবোধে মিসেস তালুকদারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু তত্ত্বতলাশ নিলেন। অতঃপর তাঁর ঝুলি থেকে বার করলেন বেড়ালছানাটিকে : আপনাকে একটি ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করছি প্রফেসর তালুকদার, কিছু মনে করবেন না। 'সলিল মিত্র' নামে আপনার কোনো নিকট আত্মীয় আছে ?

ক্ষুরধার বুদ্ধির মানুষটি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলেন ব্যাপারটা। ওঁর মনে পড়ে যায় অ্যালিস্‌টার ম্যাকলিন-এর একটি ক্রাইম থ্রিলার-এর কথা : 'ফিয়ার ইজ দ্য কী !' ভয় ! আতঙ্ক ! তিল-তিল করে প্রয়োগ করতে হয়। মাস্তান নামে ঐ যে ছেলেটি ওঁর সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে নেমেছে সে চায় চারিদিক থেকে ওঁকে ঘিরে ধরতে। প্রকারান্তরে সে বুঝিয়ে দিতে চায়—ওঁর আত্মীয়-স্বজন, ওঁর কর্মস্থলের উপরওয়ালার সব সন্ধান

সে যোগাড় করেছে। চতুর্দিকেই সে বোমা ছড়িয়ে যাচ্ছে। সব বিস্ফোরকই এক সূত্রে আবদ্ধ। ওঁর প্রত্যাখ্যানমাত্র 'ফিউজ'-এ অগ্নি-সংযোগ করা হবে। মুহূর্তমধ্যে কলকাতা শহরের সবচেয়ে নামকরা কলেজের অতি সম্মানীয় কেমিস্ট্রির অধ্যাপক রঞ্জন তালুকদার পি. আর. এস. ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন ! 'ফিয়ার ইজ দ্য কী !' তিনটি দিন সময় সে দিয়েছে ওঁকে। শুধু টাকা সংগ্রহের জন্য নয়, পঁচিশ হাজার টাকাকে ছোট ছোট ব্যবহৃত নোটে রূপান্তরিত করতেই শুধু নয়—ঐ বাহাত্তর ঘণ্টা ভয়ে একেবারে কাঁটা হয়ে থাকতে !

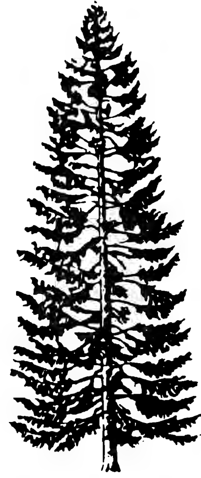
তালুকদার বললেন, আমার উপাধি শুনে ঠিক বোঝা যায় না স্যার যে, 'তালুকদার' একটা নবাবী খেতাব। আমার পূর্বপুরুষরা পেয়েছিলেন। বাস্তবে আমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। 'মিত্র' কীভাবে আমার নিকট আত্মীয় হবে ?

—না, মানে, আজকাল তো অসবর্ণ বিবাহ ঘরে-ঘরে। তাই বলছি। ব্যাপারটা কী জানেন ?...

একই কাহিনী। অজ্ঞাতনামা একটি অবাঙালী লোক ভাঙা-ভাঙা বাংলায় প্রিন্সিপাল-সাহেবকে টেলিফোনে একটি অনুরোধ করেছে। তার অভিযোগ : প্রফেসর তালুকদারের এক নিকট আত্মীয় সলিল মিত্র আবেদনকারীর পিস্‌তুতো ভগিনীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। বিস্তারিত কিছু সে বলেনি। শুধু আর্জি পেশ করেছে যাতে প্রফেসর তালুকদার মধ্যস্থতা করে ঐ সলিল মিত্র আর তার ভগিনী মালিনীর 'মানি-সেট্‌লমেন্ট' কেসটা তাড়াতাড়ি ফয়শালা করে দেন।

তালুকদার সরাসরি জানিয়ে দেন, আজ্ঞে না। লোকটা কোথাও কিছু ভুল করেছে। সলিল মিত্র নামে আমি কাউকে চিনি না।





শনিবার সওয়া আটটা নাগাদ উনি ওঁর স্টাডি-রুমে এসে বসলেন। ঐ নাছোড়বান্দা ছিনেজোঁকটির সঙ্গে একাই মোকাবিলা করতে হবে। দ্বৈরথ সমরে। তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী ছাত্র, শিষ্য, পাঠক-পাঠিকা। কিন্তু কারও কাছে সাহায্য চাইবার কোনো উপায় নেই। একদিকে ঐ মাস্তান, উদ্ধত যুবক, তার সঙ্গীসাথী, তার আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি-ক্ষুর-অ্যাসিড বাল্‌ব, পেটোয়া পুলিস, অন্য দিকে প্রৌঢ় একজন পণ্ডিত। ল্যাবরেটরি আর লাইব্রেরির চৌহদ্দিতে জীবনটা যিনি পাড়ি দিয়ে এসেছেন নির্বিবাদে! তাঁর হাতিয়ার তাঁর শিক্ষা, তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর সারাজীবনে হার-না-মানার স্ট্যামিনা! ভয় পেলে চলবে না, ভয় তিনি পাননি। দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত বৃদ্ধ মানুষটি।

স্টাডিরুম ভিতর থেকে বন্ধ। পাশের ঘরে ধর্মেন্দ্র না শশী কাপুর কে যেন ভিলেনকে ক্রমাগত ঢিশম্-ঢিশম্ কিলিয়ে চলেছে। টি. ভি.-তে। প্রফেসর তালুকদারও ঐভাবে মাস্তানকে ঠ্যাঙাতে পারেন, যদি ভিলেনের ঘুঁসিগুলো ওঁর হয়ে খায় ওঁর ডামি। না হলেও পারেন, যদি নেপথ্য নাট্যকারের তাই নির্দেশ থাকে। বৃদ্ধ বলে তিনি লড়তে ভয় পাবেন না। ও-ঘরে প্রণতি আর রামু সেই লড়াই দেখতে বুঁদ। ওরা জানে না, ঠিক পাশের ঘরে এই নিরস্ত্র বৃদ্ধ এক রিভলভারধারীর সঙ্গে একইভাবে মোকাবিলার তাল ভাঁজছেন। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় রিঙিং টোন শুরু হতেই তুলে নিয়ে তার 'কথামুখে' বললেন : তালুকদার।

—নমস্তে! রোপেয়ার ইন্তেজাম হইয়েসে স্যার?—কী বিনীত মোলায়েম কাকুতি!

—না!

—না! কেনো! তিন-সেট পিকচার আর নিগেটিভ আপনি খরিদ করবেন না?

—করব! কিন্তু...

—আ! সমঝ্‌লম! ভাও লিয়ে দরাদরি করবার হিঞ্ছা হইয়াসে?

—না! দরাদরি নয়। আমি জানতে চাইছি কেন তুমি প্রিন্সিপাল-সাহেবকে ফোন

করেছিলে ? জগদীশকে কেন বলেছ...

—আহাহা ! দিমাগ খারাপ করছেন কেন প্রফেসর-সা'ব ? আসল কথা তো কিছু বলি নাই প্রফেসর-স্যার ? আমি কি ওঁদের বলেছি, প্রফেসর তালুকদার-সাহাব এক ছুক্‌রির সঙ্গে লেংটা-খেলা খেলিয়েসেন ? আপন গড ! সি-কথা কুছু বলি নাই। বেহুদ্দো দিমাগ কেনো খারাপ করছেন, স্যার ? ছবি আর নেগেটিভ কিনে লিন, ব্যস্। লেঠা চুকিয়ে যাক। ই-স্‌ব নোংরা ঝামেলা হমার বুঢ়া লাগে।

—তার আগে ঐ মেয়েটির সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। টাকার প্যাকেটটা আমি শুধু তার হাতেই দেব। অন্য কাউকে নয়।

—তা তো হোবে না, স্যার। সি ইখানে না আছে। তাকে কী দরকার ?

—একমাত্র তাকেই আমি দেখলে চিনতে পারব।

—লেকিন সি তো কলকাত্তামে না-আছে। পাকিট হামাকেই দিতে হোবে। হামি আইডেন্টিটি দেখিয়ে তবে লিব।

—কী আইডেন্টিটি ?

—তিন সেট পিকচার ঔর নিগেটিভ।

—সে সব আমি চাই না।

—চান না, ওয়াপস লিবেন না। লেকিন কেনো ?

—তুমি তো দশ কপি করে প্রিন্ট বানিয়ে রেখে ওগুলো আমাকে ফেরত দিতে পার। আমি তোমাকে টাকাটা দিলেই তুমি আবার নতুন করে টাকা চাইতে পার। ঠেকাচ্ছে কে ?

—'আপন গড' স্যার ! সি্রেফ তিন সেট বানিয়েসি্। আপন মাই অনার !

প্রফেসর তালুকদার নীরবে অপেক্ষা করেন।

—কী হল স্যার ? কুছু তো বোলেন ?

—আমি কী বলব, মাস্তান ? তুমি বলছ 'আপন গড', 'আপন মাই অনার'—এ ক্ষেত্রে আমি কী বলতে পারি ? তোমার মতো অনারেবল...

—অ ! তা আপনি কী চাইছেন ?

—সেই মেয়েটি যদি টাকা নিতে না পারে তবে তোমাকেই আমি প্যাকেটটা দেব, তবে স্ট্যাম্প্‌ড্ রসিদ নিয়ে।

—কী নিয়ে ? রিসিট ?

—হ্যাঁ, তাই। রসিদ। রিসিট !

—আপনি কি দিল্লাগি শুরু করলেন স্যার ? ব্ল্যাকমেলিং-এর রুপেয়া কেউ কখনো রসিদ দিয়ে নেয় ?

—তা তো আমি জানি না। আমার জানার কথা নয়। এই জীবনে কখনো

ব্ল্যাকমেলিঙের টাকা নিইওনি, দিইওনি। তবে ঐ আমার শর্ত। আমি একটা কাগজে লিখে নিয়ে যাব—"পত্রবাহকের কাছে ব্ল্যাকমেলিং বাবদ পঁচিশ হাজার টাকা খুচরো নোটে বুঝিয়া পাইলাম।" স্ট্যাম্প প্যাডও নিয়ে যাব। তুমি তার নিচে তোমার বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দিয়ে টাকাটা আমার কাছ থেকে নেবে!

—আপনি পাগল হইয়ে গেসে্ন, স্যার। তাই কি হামি পারি?

—না পার টিপছাপ দিও না। রসিদ দিও না। আমিও টাকাটা দিতে পারব না।

—ও. কে.। তাইলে কালই তিন সেট পিকচার ডাকে ডেলে দিই।

—ক্ষমতা থাকে দাও!

—ক্ষেমতা! কেঁও? হমার হিম্মতে কুলাবে না?

—তাই তো আমার ধারণা!

—তিনঠো লেফাফা ডাক-বাক্সে গিরাতে সে্কব না আমি?

—সেই কথাই তো বলছি আমি। বারে বারে বলছি।

—লেকিন কেঁও?

—কারণ তোমার এক্তিয়ারে ঐ একটিই একাঘ্নী বাণ আছে, মাস্তান! ও দিয়ে তুমি ঘটোৎকচকে বধ করতে পার—আলবৎ পার—কিন্তু অর্জুন তাহলে জীবিত থাকবে। তোমার কন্‌ভিকশন তো অর্জুনই করবে, তাই নয়? আই. পি. সি.-তে ব্ল্যাকমেলিঙের জন্য ম্যাক্সিমাম কত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের প্রভিসন্স আছে তা ভোলনি নিশ্চয়। অর্জুনই সে ব্রহ্মাস্ত্রটা ছাড়বে, তাই নয়? ঘটোৎকচ তো বেফাজুল? 'কর্ণার্জুন' নাটকে এলেবেলে-চরিত্র!

—কী উল্টাসিধা বক্‌ছেন প্রফেসার-সাহাব!

—মহাভারত যে পড়নি তা জানি, কিন্তু চোপড়া-সাহেবের সিরিয়ালটাও দেখনি রোব্বারে?

—হামি সচ্‌মুছ কুছু সমঝাতে পারছি না, স্যার!

—অলরাইট! মহাভারত তুমি পড়নি! কিন্তু তাস খেল নিশ্চয়। শোন! তোমার হাতে আছে রঙের টেক্কাখানা! ম্যায়নে মান্‌লি! একটা পিঠ তুমি তুলবেই। কোন শুয়ারের বাচ্চা রুখতে পারবে না! তাই না মাস্তান? কিন্তু তারপর! টেক্কাখানা তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবার পর? মানছি, আমার নানান অসুবিধা হবে, নানান্ বেইজ্জতি। হয়তো চাকরি ছেড়ে দেব। কিন্তু তুমি? শুধু পঁচিশ হাজার টাকাই খোয়াবে না—উপরন্তু আমার মতো একটা শত্রুকে লাভ করবে। বদলা না নিয়ে যে আমি থামব না তা তুমি নিশ্চয় বুঝছ! বয়স হয়েছে, তবু শত্রু হিসাবে আমি লোকটা যে সাঙ্ঘাতিক তা তোমার ভালরকম জানা। তাছাড়া তুমি জান নিশ্চয়, সোঙ্কী ইতিমধ্যে পুলিসে ডায়েরি করেছে...

—সোন্ধী ! সৌন্ধী কৌন আছে ?

—ন্যাকা সাজবার চেষ্টা কর না মাস্তান ! য়ু আর অলরেডি হাফ-এক্সপোজড ! তুমি জান যে, পুলিসে এইট বাই টোয়েন্টি অ্যাপার্টমেন্টে সাত-সাতটা লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছে। একটা মেয়ের, আর একটা ছেলের। য়ু নো ড্যাম ওয়েল, হোয়াট্‌স আ লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তুমি জান, পুলিস রেকর্ডে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে কি না। যদি জীবনে কখনো কনভিকশন হয়ে থাকে, যদি কখনো কোনো হাজতে রাত্রিবাস করে থাক, তাহলে য়োর ফিঙ্গারপ্রিন্ট উড ট্যালি...

—হামি কুছু সমঝাতে...

—লেকিন হামি সব কুছ সমঝেছি মাস্তান ! ডু হোয়াটএভার য়ু থিংক বেস্ট ! আই নো অ্যান্ড দ্য পুলিস নো দ্যাট য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ পার্ফেক্টলি ! গুড নাইট !

—শুনুন স্যার, প্লীজ...

তালুকদার লাইনটা কেটে দিলেন।

'ফিয়ার ইজ দ্য কী !'

তীক্ষ্ণধী মানুষটি ইতিমধ্যে 'দুইয়ে-দুইয়ে চার' করেছেন।

সদ্যসমাপ্ত অ্যাপার্টমেন্ট। প্রকাণ্ড বড় ফ্ল্যাট, অথচ আসবাবপত্রবিহীন ! তার একটাই অর্থ হতে পারে : মালিক ফ্ল্যাটের দখল নিয়েছে, নেম-প্লেট বসিয়েছে, নগদ-টাকার জোরে টেলিফোন কানেকশান পর্যন্ত পেয়েছে, কিন্তু সপরিবারে ফ্ল্যাটটা দখল করেনি। এটা বোঝা যায়। একটা ফ্রিজ, একটা ডবল-বেড খাট আর একটা সিলিঙ ফ্যান। ব্যস ! কেন ? সম্ভবত পূর্ববর্তী এক-কামরার ফ্ল্যাট থেকে এগুলি স্থানান্তরিত করে সোন্ধী অপেক্ষা করছিল। হয়তো ওর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার দিল্লীতে, বোম্বাইয়ে বা ব্যাঙ্গালোরে। দু-চার মাস পরে, বাচ্চাদের পরীক্ষা শেষ হলে—হয়তো ওরা সবাই আসবে। এই সুযোগটা নিয়েছে ঐ মাস্তান-পার্টি। যে কোনোভাবেই হোক ঐ সদর দরজার একটা ডুপ্লিকেট চাবি যোগাড় করেছে।

সেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওরা কারবার ফেঁদে বসেছিল। হয়তো এতদিনে সোন্ধী আচমকা সপরিবারে ফিরে এসেছে। হয়তো বিগত সপ্তাহে সে পাঁচ সাতটা বিচিত্র টেলিফোন কল পেয়েছে। কেউ খুঁজছে সরযূকে, কেউ নমিতাকে, কেউ মালিনীকে। অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিচয় সযত্নে গোপন রাখতে চায়। নাম জানতে চাইলেই লাইন কেটে দিয়েছে। কেন ? সোন্ধী সন্দিগ্ধ হয়েছে—খোঁজ নিতে গিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে জেনেছে 'কে বা কাহারা' তার ফ্ল্যাটে বাস করে গেছে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক। প্রতিবেশীরা ধরে নিয়েছিল তাঁরা সোন্ধীর রিস্তেদার। হয়তো তাই মায়াজাল বিস্তার করে সোন্ধী জানবার চেষ্টা করেছিল প্রফেসর তালুকদারের পরিচয়। নিদেন তাঁর টেলিফোন নাম্বার। মাস্তান এ বিষয়ে কতটা কী জানে তা

জানা নেই—কিন্তু সোদ্ধী যে সন্দিগ্ধ, অ্যাপার্টমেন্টটা হাতছাড়া হবার পরেই তা বুঝেছে। হয়তো আচমকা পালাতে গিয়ে ফ্রিজে ফেলে আসতে হয়েছে অর্ধসমাপ্ত বিয়ার অথবা জীন-এর বোতল !

'ফিয়ার ইজ দ্য কী !'—আতঙ্কের বলটা উনি ও-কোর্টে ফিরিয়ে দিলেন।

রবিবার রাত সাড়ে-আটটায় টেলিফোন রিসিভারের পাশে চুপচাপ বসে ছিলেন। ওঁর টেবিলের উপর একটা ইংরেজি পেপারব্যাক গল্পের বই, পাতা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে : ফ্রেডেরিক ফরসাইথ-এর 'নো কামব্যাক্স্' ! একটা পাতাও পড়তে পারছেন না। আশা ছিল, আতঙ্কগ্রস্ত ব্ল্যাকমেলার একই সময়ে ফোন করবে। সে সময়ে অন্য কেউ ফোনটা তুলুক তা উনি চান না।

ঠিক তাই—সাড়ে আটটায় বেজে উঠল টেলিফোনটা।

—তালুকদার স্পিকিং।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই বলছি। আপনি অহেতুক দরাদরি করছেন, স্যার। আপনি আমাকে চেনেন না। এসব ব্যাপারে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, জানে মারা পড়বেন কিন্তু।

পরিষ্কার সহজ সরল বাঙলা উচ্চারণ। কাবুলিওয়ালার সেই "খোঁকী তোমি সসুরবাড়ি যাবিস্'—গোছের বিকৃতির চিহ্নমাত্র নেই।

তালুকদার বললেন, লুক হিয়ার, মাস্তান ! আয়াম নট্ আফটার এনি বারগেন !...অর ডু য়ু স্টিল প্রিটেন্ড দ্যাট য়ু ডোন্ট ফলো মি ?

—না স্যার ! আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি।

—তাহলে ? আমি তো একটা নয়া পয়সা কমাবার কথা বলিনি ! পুরো পঁচিশ হাজারই দেব। সমস্তই দশ বা বিশ টাকার নোটে। বিনিময়ে আমার ঐ শর্তটা তোমাকে মানতে হবে।

—ঐ রসিদে সই দিয়ে ব্ল্যাকমেলিঙের টাকা নেওয়া ?

—হ্যাঁ, কিন্তু শুধু সই নয়, বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের টিপছাপ।

—আপনাকে একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবেন স্যার ?

—ইতস্তত করছ কেন ?

—ঐ যে কাল আপনি বললেন, 'তোমার মতো অনারেব্‌ল...', কিন্তু এখন যেটা বলছি তা আপনি যাচাই করে জেনে নিতে পারেন...

—কী কথা ?

—ঐ ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিয়ে আপনি কিস্‌সু করতে পারবেন না। অ্যাসুমিং আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট পুলিসের কাছে আছে, অ্যাসুমিং সেই টিপছাপের সঙ্গে সোদ্ধীর বাড়িতে ওরা যে টিপছাপ পেয়েছে তা মিলে গেল। তাহলে কী হবে ?

—তুমিই বল ?

—মাকড় মারলে যা হয় : ধোকড় ! খুঁটির জোরে ম্যাড়া লড়ে শোনিননি ? কোন শালা পুলিসের বড়সাহেবের হিম্মৎ হবে না...

—তাহলে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

—এটাই আপনার ভুল। 'ভয়' আমি আদৌ পাইনি। কিন্তু তাই বলে বেহুদ্দো পঁচিশ-হাজার টাকা খোয়াতেও আমি রাজি নই।

—বুঝলাম ! তা এতই যদি বেপরোয়া তাহলে টিপছাপ দিয়ে ব্ল্যাকমেলিঙের টাকা নিতেই বা তোমার আপত্তি কিসের ?

—কিন্তু ঐ টিপছাপ নিয়ে আপনি কী করবেন ? পুলিসে যাবেন ? আপনার ছাত্র সেই দিল্লীতে-পোস্টেড কল্যাণ সেনগুপ্ত, আই. পি. এস. ?

তালুকদার বুঝতে পারেন লোকটা কতদূর খবর রাখে।

বলেন, না, মাস্তান। আমি পুলিসে যাব না আদৌ। রসিদটা ব্যাঙ্ক ভল্টে রেখে দেব।

—বাট হোয়াই ? কেন ?

—দেখ মাস্তান, আমি খোলা কথার মানুষ। হ্যাঁ, ভুল আমি একটা করেছি। তোমরা আমাকে বোকা বানিয়েছ। আমার অবশ্য এখনো দৃঢ় বিশ্বাস—সেই মেয়েটি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে কোনও তঞ্চকতা করেনি। কেন এমন অদ্ভুত ধারণা হয়েছে, ওয়েল, তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। ইন ফ্যাক্ট, তুমি যে স্তরের মানুষ, তাতে তোমার পক্ষে ওসব বোঝা সম্ভবপরও নয়। বাদ দাও সে-কথা ! 'অ্যাভেইলেব্‌ল্ ডাটা' অনুসারে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মেয়েটি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তোমাকে ব্ল্যাকমেলিঙের সুযোগ করে দিতে। স্বীকার করতেই হবে, তোমরা আমাকে বোকা বানিয়েছ। ওয়েল, তার মূল্য আমি দেব। কড়ায়-গণ্ডায়। যা তুমি চেয়েছ—গোনাগুন্তি পঁচিশ হাজারই। কিন্তু দুবার নয়। একবার ! আমার মৃত্যুবাণ যেমন তোমার কাছে থাকবে, তেমনি তোমার মৃতুবাণও থাকবে আমার কাছে। দু-পক্ষের আর্সেনেলে হাইড্রোজেন বোমা থাকলে, কোন পক্ষই সেটা ফাটাতে পারে না। ফলো ?

—আজ্ঞে না। যতক্ষণ না আমি মেনে নিতে পারছি যে, ঐ টিপছাপ দেওয়া রসিদটা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে।

—তাহলে তা দিতেই বা তোমার এত আপত্তি কেন ?

—যেহেতু এটা একটা অ্যাবসার্ড প্রপোজিশান ! পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কোনদিন রসিদ দিয়ে ব্ল্যাকমানি নেয়নি।

—তার কারণটা কী তা জান ?

—না। আপনিই বলুন ?

—অলরাইট ! কারণটা আমিই বলছি। কেন তুমি ভয় পাচ্ছ টিপছাপ দিতে।

—ভয় আমি পাচ্ছি না।

—পাচ্ছ ! আলবৎ পাচ্ছ ! একশবার পাচ্ছ ! কেন পাচ্ছ, তা তুমিও জান, আমিও জানি।

—কী, বলুন ?

—তুমি জান, ভারতবর্ষে আজ যারা ক্ষমতার চূড়ায় কাল তারা অপজিশন বেঞ্চে গিয়ে বসতে পারে। আজ যাদের প্রভাবে তুমি হাতে মাথা কাটছ তারাই তখন পথে পথে মিছিল করে ঘুরে মরতে পারে : আমাদের দাবী মানতে হবে ! সেই দুর্দিনে ঐ টিপছাপ, ঐ রসিদ তোমার কাছে হাইড্রোজেন বোমারই সামিল ! তাই না তোমার এত আপত্তি ? কী ? মাস্তান-সাহেব ?

ওপক্ষ তবু জবাব দিল না।

—হ্যালো, মাস্তান ? তুমি লাইনে আছ ?

—আছি স্যার ! আপনি একটি পাক্কা হারামজাদা ব্যক্তি আছেন ! অলরাইট, ঐ শর্তেই আমি টাকাটা নেব।

—রসিদ দিয়ে ? টিপছাপ দিয়ে ?

—উপায় কি ? টাকাটার বড় জরুরি দরকার। আই এগ্রি ! কোনপক্ষই বোমা ফাটাতে পারবে না কোনদিনই। আজকে যারা পার্টি-ইন-পাওয়ার তারা অপজিশানে গেলেও আপনি ঐ রসিদটা দাখিল করতে পারবেন না। কারণ তাহলে ঐ ফটোগুলোও আমি দাখিল করব। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস যেদিকেই মোড় নিক আপনাকে ইজ্জত বাঁচাতে হবেই !

—তাহলে টিপছাপ দিয়ে টাকাটা নেবে ?

—বলছি তো তাই নেব।

—কিন্তু ঐ মেয়েটারও টিপছাপ যে আমার চাই ?

—দ্যাটস্ ইম্পসিব্ল্। বিশ্বাস করুন, ও এখানে নেই।

—অলরাইট। কোথায় কীভাবে টাকাটা তোমাকে দেব তা এবার বল। সাতটা দিন সময় আমাকে দাও। টাকাটা জোগাড় করতে, আর দশ-বিশটাকার খুচরো নোটে তা ভাঙাতে। আজ রবিবার। আগামী রবিবার টাকাটা তোমাকে আমি দেব। বল, কখন কোথায় ?

—রবিবার দেবেন ? ওয়েল, তাহলে শনিবার বলব, এই সময়ই।

—আজ বলতে পার না ?

—ছেলেমানুষী করবেন না, স্যার !

লাইন কেটে দিল লোকটা।



সোমবার সকালে ঘটল একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা।

কলেজ গেট-এর শ-দুই গজ দূর থেকেই গাড়ির গতি কমিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। সামনে কী একটা হৈ-চৈ বিক্ষোভ হচ্ছে। পথ-চল্‌তি কে-একজন আগবাড়িয়ে বললে, ওদিকে যাবেন না দাদু, বোম্‌ ফাটছে।

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে সেটা নতুন কিছু নয়। এ-পথে বৃষ্টির জলে যেমন জ্যাম হয়, বেহুদ্দো গাড়িতে-গাড়িতে জট পাকিয়ে যেমন জ্যাম হয়, তেমনি বোমা পড়ার কারণেও রাস্তা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষজন তখন বড় রাস্তা এড়িয়ে গলি-ঘুঁজি ধরে চলে। এদিক-সেদিক অসংখ্য গলিপথ।

কলেজ স্ট্রিট এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

তালুকদার লোকটির পরামর্শ মেনে নিলেন। গোলদিঘি পাক মেরে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটুট 'হল' ঘুরে এসে পড়লেন বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিটে। হিন্দু স্কুলের বিপরীতে ওঁর জানা এক প্রকাশকের দোকানের সামনে গাড়িটা পার্ক করে নেমে এলেন।

দোকানের মালিক ওঁকে আপ্যায়ন করে বসালো। উনি জানতে চাইলেন, কলেজের সামনে গণ্ডগোলটা কিসের ?

প্রকাশক অমায়িক হেসে বললেন, আদার ব্যাপারি স্যার, জাহাজের খোঁজ রাখিনা। কিছু একটা 'আমাদের দাবী' নিশ্চয় আছে, যা বোধ করি কেউ মানছে না, তাই তার 'কালো হাত ভেঙে দেওয়ার', অথবা 'গুঁড়িয়ে দেওয়ার' আয়োজন। তবে এটুকু খবর পেয়েছি যে, পুলিসভ্যান এসে গেছে। একটু পরেই রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ট্রামবাস চলবে আবার।

—কিন্তু আমার যে বারোটা দশে ক্লাস।

—ভুলে যান, স্যার। আপনি প্রেজেন্ট স্যার হলেও আপনার ছাত্রছাত্রীরা সবাই 'অ্যাবসেন্ট স্যার' ! কী খাবেন বলুন, গরম না ঠাণ্ডা ?

—আরে না, না, আগে দেখে আসি ব্যাপারটা কী। শোন, আমার গাড়িটা রইল

তোমার দোকানের সামনে। কেউ না চাকা খুলে নিয়ে যায়। একটু নজর রেখ।

—ঠিক আছে স্যার, যান। পুলিস ভ্যান এসেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। এতক্ষণে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

গাড়িটা দোকানের সামনে লক করে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন কলেজ গেট-এর দিকে। এখনো সেখানে চাপ ভিড়। উত্তেজিত ছাত্রদের চিৎকার চেঁচামেচি, স্লোগান, কাউন্টার-স্লোগান। পুলিস ভ্যানের পাত্তা নেই। ট্রাম এখনো চালু হয়নি। গেটে ঢুকবার মুখে বাধা পেলেন। ভিড়ের ভিতর রাস্তা করে এগিয়ে যাওয়াই মুশ্‌কিল। হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটি ছাত্র, ফোর্থ ইয়ার-এর তাপস মিত্র। ভিড় সরিয়ে রাস্তা করে দিয়ে বললে, আসুন, আসুন স্যার, গাড়ি কোথায় রাখলেন ?

—হিন্দু স্কুলের সামনে। আজ আবার কী নিয়ে গণ্ডগোল ?

—অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে, স্যার। বলছি....না, না, ওদিকে যাবেন না। প্রিন্সিপাল-সাহেব ঘেরাও হয়ে আছেন। ওদিকে গেলে আপনিও ফেঁসে যাবেন। সোজা কেমিস্ট্রি ল্যাবে চলে যান।

—প্রিন্সিপ্যাল-সাহেব ঘেরাও হয়ে আছেন ? কেন ? কী ব্যাপার ?

—তাহলে এদিকে সরে আসুন। একটু আড়ালে না হলে...

এত উত্তেজনাতেও ডেভিড হেয়ার নির্বিকার। বোমাই ফাটুক আর গুলিই ছুটুক জোব্বা গায়ে একইভাবে বই-বগলে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ বলে নয়। দশকের পর দশক। তাঁরই পায়ের কাছে সরে এলেন ওঁরা দুজন।

তাপস মিত্র ছাত্র য়ুনিয়ানের পাণ্ডা। তবে এবার ওদের পার্টি ইলেকশান জিততে পারেনি। বিধানসভার নজির দিয়ে বলা যায় তাপস এখন বিরোধী দলপতি। সে সংক্ষেপে যা জানালো তা এই রকম :

সকাল পৌনে-দশটায় কলেজের সামনে একটা দুঃসাহসিক 'অ্যাবডাক্‌শন-কেস' হয়ে গেছে। কলেজের একটি ছাত্রী ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে কলেজে আসছিল, মাঝ-সড়কে তিন-চারজন গুণ্ডা তাকে চেপে ধরে। ওরা এসেছিল কালো রঙের একটা অ্যাম্বাসাডারে। সেটা রাস্তার ধারেই স্টার্টে রাখা ছিল, চালকের আসনে ড্রাইভার রেডি হয়ে বসে প্রতীক্ষা করছিল। মেয়েটি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিন-চারজন ষণ্ডা-মার্কার সঙ্গে সে পারবে কেন ? প্রকাশ্য দিনের আলোয় কয়েক শ দর্শকের চোখের সামনে ওরা জোর করে মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে ফেলে। চার-পাঁচটি ছেলে ছুটে গিয়েছিল বাধা দিতে। তখন ওরা পরপর দুটো বোমা ফাটায়। তার স্প্লিন্টারে একজন আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর একটি ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাড়ির উপর। গুণ্ডাদলের একজন ছেলেটির তলপেটে ছোরা বসিয়ে দেয়।

তিন-চার মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটে যায়। ঠিক তারপরেই কলেজ গেটের

সামনে মারামারি বেধে যায়। দুই রাজনৈতিক দলের সহানুভূতিশীল ছাত্রদের মধ্যে। একটু পরেই পুলিস ভ্যান এসে যায়। তাপসদের পার্টির তিনটি ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। অতি সংক্ষেপে এই হল ঘটনার বিবরণ।

—তাহলে প্রিন্সিপাল-সাহেব ঘেরাও হলেন কেন ?

—উনি ছেলেদের জামিনের ব্যবস্থা করছেন না বলে। বলছেন, পুলিসে যাদের অ্যারেস্ট করেছে তারা রাস্তায় ছিল, কলেজ-ক্যাম্পাসের ভিতরে নয়। ফলে তারা ছাত্র না, সাধারণ নাগরিক...

—অলরাইট ! এস আমার সঙ্গে—

—না, স্যার। আপনি ওদিকে যাবেন না। তাহলে আপনিও ঘেরাও হয়ে যাবেন। আমি ঠেকাতে পারব না।

—তুমি ভুলে গেছ তাপস, 'ছাত্র-শিক্ষক কল্যাণ সমিতি' বলে একটা সংস্থান আমরা এই কলেজে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, আর আমি তার প্রেসিডেন্ট। তুমিও আছ সেই কমিটিতে। এস, আর কথা বাড়িও না।

প্রিন্সিপাল-সাহেবের ঘরে তিল-ধারণের ঠাঁই নেই। সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে চায়, ফলে কারও কথাই শোনা যাচ্ছে না। তদুপরি মাঝে মাঝে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি। প্রিন্সিপাল হাত নেড়ে ছেলেদের কিছু বোঝাতে চাইছেন, তাঁর একটা শব্দও শোনা যাচ্ছে না। অন্তত এতদূর থেকে।

তালুকদার-সাহেব চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাপস ওঁর ভিতরে ঢোকার পথ করে দেবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ তাঁকে দেখে নিজে থেকেই সরে যায়। দু-একজন এদিকে ফেরে।

তালুকদার ছাত্রবয়সে অভিনয় করতেন নাটকে। 'টপ-ভয়েস' কীভাবে নিক্ষেপ করতে হয় সে কায়দাটা ভুলে যাননি। সেই উচ্চগ্রাম কণ্ঠস্বরে তিনি বজ্রনির্ঘোষে হাঁকাড় পারেন, কম্‌রেডস্ ! প্লীজ লেন্ড মি দাইন ইয়ারস্ !

মন্ত্রের মতো কাজ হল তাতে। চিৎকার চেঁচামেচি একদম থেমে গেল। ঘরশুদ্ধ সবাই দ্বারপথে দৃক্‌পাত করে এই নতুন অভিনেতার দিকে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে তালুকদার-সাহেব ইংরেজিতেই বলে চলেন, আশা করি তোমরা সবাই আমাকে চেন... না, না রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পরিচয়ের কথা বলছি না আমি... তোমরা জান যে, দুঃসময়ে যৌথব্যবস্থা নেবার সুবিধা হবে বলে আমরা এ বছর একটি 'ছাত্র-শিক্ষক কল্যাণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি সে কথাই বলছি। তোমরা জান, আমি সেই সমিতির সভাপতি !... কমরেডস্ ! আমি এইমাত্র কলেজে এসে জানতে পেয়েছি যে, ঘণ্টা-কতক আগে কলেজ গেট-এর কাছে—কলেজ ক্যাম্পাসের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরেই হোক, অথবা বাইরে—পরপর কয়েকটি

মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। যার ফলে কলেজের একটি ছাত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও যেতে হয়েছে, তিনজন ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে এবং তিনজন ছাত্রকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। এর প্রতিবিধানের জন্য আমি এই মুহূর্তেই আমাদের সমিতির একটি কার্যকরী-সভার আহ্বান জানাচ্ছি। সবাইকে খবর দেবার সময় নেই। ঐ কমিটির যে কয়জন সভ্য-সভ্যা এখানে উপস্থিত আছ তারা আমার সঙ্গে রসায়ন বিভাগে লেকচার থিয়েটারে চলে এস। আর যারা ঐ দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তারাও চলে এস। .... একটা কথা, কমরেডস্। আমাদের এই কলেজ এশিয়ার মধ্যে একটি সুবিখ্যাত ঐতিহ্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান... এর মর্যাদা রক্ষা করার দায় তোমাদের, দায় আমাদের ! ...যারা সত্যিই এ অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাও, তারা আমার সঙ্গে চলে এস, আর যারা শুধু খ্যাপা কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করতে চাও তারা প্রিন্সিপাল-সাহেবকে ঘিরে 'হাউল' করতে পার।

একতরফা বক্তব্যটা পেশ করে মুহূর্তমধ্যে উনি চলতে শুরু করলেন।

যেন, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। গোটা দলটা তাঁর পিছু নিল। কিছুদূর এগিয়ে উনি আবার থেমে পড়েন। পিছন ফেরেন। পশ্চাতে অনুসরণকারী ছাত্রছাত্রীদের সম্বোধন করে বললেন, সবাই এসে ভিড় করলে কোন কাজ করা শক্ত হবে। শোন, যারা ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং যারা ঐ 'ছাত্র-শিক্ষক কল্যাণ সমিতি'র সভ্য-সভ্যা তারাই শুধু আমার সঙ্গে এস। বাদবাকি ছাত্রছাত্রীদের আমি ক্লাসে যেতে বলছি না, এই মানসিক অবস্থায় সেটা সম্ভবপর নয়। তোমরা মাঠে অপেক্ষা কর। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে আমরা আমাদের কার্যকরী সিদ্ধান্ত জানাব। তোমরা তাতে সন্তুষ্ট না হলে আমাকে ঘেরাও করতে পার, পুনরায় প্রিন্সিপাল-সাহেবকে ঘেরাও করতে পার, অথবা আমাকে 'ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট' করতে পার। কিন্তু প্লীজ কমরেডস্, ডোণ্ট স্টার্ট হাউলিং এগেন !

গটগট করে এগিয়ে গেলেন এরপর কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের দিকে। ওঁর অনুসরণকারী দলের অধিকাংশই মাঠের দিকে চলে গেল। জনা আট-দশ ওঁর অনুগমন করল।

লেকচার থিয়েটারে ডায়াসের উপর উঠে ওঁর নজর হল সামনের বেঞ্চিতে জনা দশেক উপস্থিত। চারজন ছাত্রী ছয়জন ছাত্র। তার ভিতর তাপস মিত্র আছে, আছে সতীশ সামন্তও। সতীশ এখন ইউনিয়ানের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি। ওদের পার্টিই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা দুজনেই ছাত্র-শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্য। কিন্তু দেবাশীষ জোয়াদ্দারকে দেখতে পেলেন না —ইউনিয়ন-ইন-পাওয়ার এর সেক্রেটারি। তাই সতীশকে প্রশ্ন করলেন, দেবাশীষকে দেখছি না। আসেনি ?

সতীশ উঠে দাঁড়ায়। বলে, না স্যার। কী জানি কেন আজ সে অ্যাবসেন্ট। আমি

ওকে বাড়িতে খবর পাঠিয়েছি।

তালুকদার বলেন, আমি কিছু ক্লাস নিচ্ছি না। তোমাদের যা জিজ্ঞাসা করব, তার জবাব বসে বসেই দিও। নাউ ফার্স্ট কোশ্চেন : সকালবেলার ঘটনার—আমি অ্যাবডাকশান কেসটার কথা বলছি—প্রত্যক্ষদর্শী কে কে ? স্বচক্ষে মেয়েটিকে অপহরণ হতে দেখেছ কে কে ? প্লীজ রেজ য়োর হ্যান্ডস্।

সামনের বেঞ্চি থেকে দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে হাত তুলল।

অধ্যাপক তালুকদার তাদের নাম বা রোল নম্বর জানতে চাইলেন না। বরং পেশ করলেন তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন : যে ছাত্রীটিকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে তাকে তোমরা কেউ চেন ?

প্রথম সারির যে দুটি মেয়ে ইতিপূর্বে হাত তুলেছিল তাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়ায়। শ্যামলা রঙ, সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরে এসেছে। বললে, আমি চিনি, স্যার। আমরা এক পাড়াতেই থাকি। হাতিবাগানের কাছাকাছি। একই ট্রামে আসছিলাম। রুবি উঠেছিল হেদোর কাছে...

—রুবি কে ?

ঐ শ্যামলা রঙের মেয়েটির ঠিক পাশেই বসেছিল আর একটি মেয়ে। সেও প্রথম প্রশ্নে হাত তুলেছিল, এবারও তুলে আত্মঘোষণা করল।

—বুঝলাম। তোমরা তিনজনে একই ট্রামে আসছিলে। কিন্তু আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম অ্যাবডাক্টেড মেয়েটির নাম....

—কৃষ্ণা সেন, থার্ড-ইয়ার, ফিলজফি অনার্স।

ভ্রূকুঞ্চন হল অধ্যাপক তালুকদারের। বললেন, কৃষ্ণা সেন ? ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় ? গতবছর স্যোসালে....

—ইয়েস স্যার ! সেই কৃষ্ণাই।

—বলে যাও....

মেয়েটি বর্ণনা করে—

ট্রাম থেকে নেমে ওরা কীভাবে ট্রাম রাস্তা অতিক্রম করতে থাকে। তিনজনই একসঙ্গে। হঠাৎ উল্টোদিক থেকে একটা ট্রাম এগিয়ে আসে। কৃষ্ণা চট্ করে পার হয়ে যায়। ওরা দুজন এপারে থেকে যায়। কিন্তু ট্রামটা ওদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করার আগেই ওপাশে কী একটা গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। ট্রামের প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় মাঝখানে যেটুকু ফাঁক আছে তার মধ্যে দিয়ে ওরা দেখতে পায় দুজন গুণ্ডা কৃষ্ণার দুই হাত ধরে টানছে ফুটপাতের দিকে। ব্যাপারটা কী হয়েছে জানবার জন্য ওরা দুজন ট্রামটার পিছন দিয়ে ছুটে ওপারে যায়। ততক্ষণে গুণ্ডারা জোর করে কৃষ্ণাকে গাড়িতে তুলছে। তিন-চারজন ছাত্র বাধা দিতে ছুটে আসে।

তখন ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে-থাকা একজন গুণ্ডা তাদের লক্ষ্য করে পরপর দুটি বোমা ছোঁড়ে। একটা ফাটেনি, দ্বিতীয়টাও কারও গায়ে লাগেনি, কিন্তু ট্রামরাস্তায় পড়ে সশব্দে ফেটে যায়। দুজন ছাত্র রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। তখন ধোঁয়ার প্রাবল্যে সামনে কী ঘটছে দেখা যাচ্ছিল না। ধূম্রজাল অপসারিত হবার পর ওরা দেখতে পায় রাস্তায় দুজন ছেলে পড়ে কাৎরাচ্ছে। কৃষ্ণার কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে পড়ে আছে। আর রাস্তার ওদিকে যে কালো রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা নেই। মেয়েটি কৃষ্ণার ব্যাগটা তুলে নেয়। লক্ষ্য করে দেখে, দশ-পনেরজন ছাত্র ছুটে যাচ্ছে আহত দুজনকে পাঁজাকোলা করে সরিয়ে আনতে। রাস্তায় জন ও যান চলাচল থমকে গেছে। মুহূর্তমধ্যে বহু মানুষের ভিড়ে রাস্তাটা ভরে যায়। ও আর কিছু জানে না। কৃষ্ণার ব্যাগটা এখনো ওর জিম্মায়। তুলে দেখায়।

তালুকদার এবার বুবির দিকে ফিরে বলেন, ও যা বলল তা তুমি কি সব করবোরেট করছ, না ও কিছু ভুল বলেছে?

—না, স্যার। আমিও ঠিক তাই দেখেছি।

তালুকদার এবার ছেলেটির দিকে ফিরে বলেন, আর তুমি?

সে কিছু বলার আগেই সতীশ সামন্ত বলে ওঠে, ওর পরিচয়টা জানি না, স্যার। তোমার নাম? কোন ইয়ার?

তালুকদার নজর করে দেখলেন, সতীশ একটা খাতায় কী সব নোট নিচ্ছে। তিনি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, সতীশ, প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি! এখানে আমিই এনকোয়ারিটা কনডাক্ট করছি। তোমাদের ইউনিয়ানের তরফে যদি পৃথক কোন তদন্ত তোমরা করতে চাও তাহলে দেবাশীষ এসে পড়লে তা তোমরা পৃথকভাবে করতে পার।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যে ছেলেটি দাবী করেছিল তার দিকে ফিরে তালুকদার পুনরায় একই প্রশ্ন করেন, আর তুমি?

—আমি স্যার রাস্তার এপাড়ে ছিলাম। ফলে স্মোকস্ক্রিনে আমার দৃষ্টিপথ আড়াল হয়নি। আমি দেখেছিলাম গাড়ির ভিতর দুজন ছিল। দুজনেই ড্রাইভারের সীটে। পিছনের সীটটা খালি। তা থেকেই ঐ তিনজন অ্যান্টিসোশাল নেমে এসে কৃষ্ণাকে চেপে ধরে। টানাটানি করে পিছনের সিটে তোলে। কৃষ্ণার ব্যাগটা হাত থেকে পড়ে যায়। সে আপ্রাণ লড়াই করে। ইনফ্যাক্ট, লাল... আই মীন যে ছেলেটি ওর ডান হাত ধরে টানছিল তার কব্জিতে এক কামড় বসিয়ে দেয়। লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। ঠিক তখনই দেবু ঐ গুণ্ডাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার চোয়ালে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি মারে....

তালুকদার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েন। বলেন, কী নাম বললে? দেবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দেবব্রত বসু।

—ফোর্থ ইয়ার ? ফিজিওলজি ?

সতীশ জানতে চায়, চেনেন স্যার ছেলেটিকে ?

তালুকদার জবাব দেন না। সিলিঙ ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে কীযেন ভাবছেন।

যে ছেলেটি জবানবন্দি দিচ্ছিল সে আবার শুরু করে, দেবু ওর চোয়ালে ঘুষিটা কষানোর সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটার পাশ থেকে আর একজন অ্যান্টিসোশাল দেবুর তলপেটে ছোরা বসিয়ে দেয়। দেবু রাস্তায় পড়ে যায়। ঠিক তখনি অ্যামবাসাডারটা চলতে থাকে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সে সামনের দিকে বেরিয়ে যায়। একটা রিক্‌শাকে ধাক্কা মেরে উল্টে দিয়ে।

তালুকদার প্রশ্ন করে জানতে পারেন, রিক্‌শা-ওয়ালার আঘাত সামান্যই। ফার্স্ট এইড নিয়ে ছাড়া পায়। কিন্তু দেবু, রতন ও জলিল—অর্থাৎ যে ছেলেদুটি বোমার আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিল তাদের সবাইকেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

—পুলিস কখন আসে ? কে পুলিসে খবর দেয় ? আর অ্যারেস্ট হয়েছে যে তিনজন তাদের নামগুলো কী ?

এবার অনেকেই ওঁকে সাহায্যে করতে পারে। কারণ এসব ঘটনা ঘটেছে আধঘণ্টা পরে। তখন বহু ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়েছিল।

সতীশ তার নোটবুকে সব কিছু লিখে নিল। তালুকদার কিছুই লিখলেন না।

সব প্রশ্ন-উত্তরের পর তালুকদার বললেন, এবার তোমাদের যে প্রশ্নটা করছি তার জবাব ভেবেচিন্তে দিও। আমি বিশেষ করে তোমাদের তিনজনকে বলছি, যে তিনজন অ্যাব্‌ডাকশান কেস-এর প্রত্যক্ষদর্শী। যে কয়জন গুণ্ডা কৃষ্ণাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল সেই অ্যান্টিসোশালদের মধ্যে কাউকে কি তোমরা চিনতে পেরেছিলে ? থিংক বিফোর য়ু আনসার।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। তিনজনই পরস্পরের দিকে তাকায়। যেন চোখে-চোখে কথা হয়ে যায়।

অবশেষে ছেলেটি বলে ওঠে, আমি একজনকে চিনি, স্যার !

হঠাৎ রুবি উঠে দাঁড়ালো। যদিও বসে-বসেই এতক্ষণ জবাব দিচ্ছিল, কথা বলছিল। বোধ করি এবার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, আমিও একজনকে চিনতে পেরেছি—ঐ যার কবজি কামড়ে দিয়েছিল কৃষ্ণা।

—আর তুমি ? নিবেদিতা ?

হাতিবাগানের মোড়ের বাসিন্দার মাথাটা এতক্ষণ ছিল বুকের উপত্যকায়। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তালুকদার-সাহেব তাকে নামে চেনেন। ধীরে-ধীরে এবার সেও উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমিও তাকে চিনতে পেরেছিলাম, স্যার। তাছাড়া যে গাড়ি চালাচ্ছিল তাকেও।

আবার একটা অস্বাভাবিক নীরবতা।

সতীশ জানতে চায়, হোয়াটস্ য়োর নেক্স্ট কোশ্চেন, স্যার ?

তালুকদার তাকে বলেন, তুমি অত উতলা হয়ে উঠেছ কেন, সতীশ ? এন্‌কোয়ারিটা আমিই তো কনডাক্ট করছি, নাকি ? আমাকে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ করতে দেবে না ? তুমি কি এতই নির্বোধ যে, বুঝতে পার না এদের নিরাপত্তার কথাও আমাকে ভাবতে হচ্ছে ?

সতীশ অধোবদনে নীরবে অপেক্ষা করে।

তালুকদার বলেন, তোমরা তিন জনে তিনটে কাগজে সেই অ্যান্টিসোশালের নাম ব্লক ক্যাপিটালে লিখে আমার হাতে দাও।

আবার ওদের চোখে-চোখে কথা হল। মনে হল, ওরা নির্দেশটা মেনে নিতে রাজি হল। তিনজনে তিনটি কাগজে কী লিখে ওঁকে দিয়ে এল। তালুকদার তিনটি কাগজের টুকরোকে একইভাবে ভাঁজ করলেন। তারপর কড়িখেলার সময় যেমন মুঠোয় করে কড়িগুলোকে ঝাঁকাতে হয় সেইভাবে ঝাঁকিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। হেসে বললেন, কে কোন নাম লিখেছ তা আর জানবার উপায় নেই, তাই না ? ঠিক আছে, এবার দেখি কাগজগুলোয় কী লেখা আছে !

ভাঁজ খুলে তিনটি কাগজের লেখা পড়লেন। তারপর তাঁর লেকচার টেব্‌লের প্রান্তে বুনসেন বার্নারটা জ্বেলে কাগজ তিনটি তার নীল শিখায়—যাকে বলে উত্তপ্ততম অংশ—মেলে ধরলেন।

সতীশ উঠে দাঁড়ায়। উত্তেজিত ভাবে বলে, এ কী করছেন, স্যার ? য়ু কান্ট ডেস্ট্রয় এভিডেন্স !

—এভিডেন্স ! কীসের এভিডেন্স ? কোন কাগজটা কার লেখা তাই তো আমি জানি না। চল, আমার তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে। আমরা এখান থেকে প্রথমে যাব থানায়। তিনটি ছাত্রের জামিনের ব্যবস্থা করতে। এবং অ্যাবডাকশান কেসটা ডায়েরি করতে। তারপর একদল যাবে কৃষ্ণার বাড়ি। সে দলে নিবেদিতা তুমি থাকবে। আর একদল যাবে মেডিকেল কলেজে জলিল, রতন আর দেবু কেমন আছে খবর নিতে। তাপস তুমি এস বরং আমার সঙ্গে। আর সতীশ তুমি অফিসে যাও, দেবু, রতন আর জলিলের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের বাড়িতে খবর দাও...

—আমি আপনার সঙ্গে থানায় যাব না ?

—কী দরকার ? দেবু বোস রতন মুখুজ্জে আর জলিল হুসেন এর বাড়িতে খবর দেওয়াটাও তো জরুরী।

—না, স্যার। আমি আপনার সঙ্গে থানাতেই যাব। ওদের তিনজনের বাড়িতে খবর দেবার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করব। এখনই ! কিন্তু জোয়াদ্দারদা নেই,

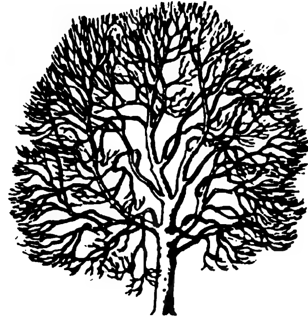
ইউনিয়ানের তরফে আমার থানায় যাওয়াটা কর্তব্য।

—অল রাইট। তাই যদি তুমি মনে কর, তাহলে তুমিও এস।

তাপস জানতে চায়, একটা ট্যাক্সি ধরব, স্যার ?

—না, আমার গাড়িটা হিন্দু স্কুলের সামনে পার্ক করা আছে। আমরা তাতেই যাব।





ও.সি. জয়ন্ত চৌধুরী ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে 'তুমিই' বলবেন স্যার, আমিও ঐ কলেজের ছাত্র। দশ বছর আগে পাশ করে বেরিয়েছি। তবে আমি ছিলাম আর্টস্‌ বিভাগে, তাই আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

তালুকদার বললেন, তাহলে তো ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। আমরা সবাই একই কলেজের। আমার সঙ্গে যে দুজন এসেছে এরা দুই ছাত্র-নেতা।

—বলুন, স্যার, কী করতে পারি আমি?

—কলেজের তিনটি ছাত্রকে তোমার পুলিস তুলে এনে হাজতে পুরেছে...

বাধা দিয়ে ও.সি. বলে, কলেজের ভিতর থেকে?

—না। কলেজ স্ট্রিটের ট্রাম-রাস্তা থেকে। গেটের সামনে থেকে। তাদের কী অপরাধ? কেন তাদের অ্যারেস্ট করা হল?

—রাউডিজম। সরকারী সড়কের উপর দাঁড়িয়ে মারামারি করা।

—আমরা এসেছি তাদের জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে।

—নিয়ে যান। আপনি যদি তাদের সনাক্ত করেন এবং পার্সোনাল বন্ড দিতে রাজি থাকেন। তবে একটা কথা : পার্সোনাল বন্ডে তাদের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য হাজতের বাইরে রাখতে পারবেন। কাল সকাল দশটার সময় একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুনরায় ওদের জামিন নিতে হবে। সেখানে আমি নিজে উপস্থিত থাকব। জামিন নেবার জন্য কোথায় যেতে হবে তাও আমি বলে দেব।

তালুকদার বলেন, জয়ন্ত, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বল তো? এটাই কি তোমার কাছে কলকাতা শহর প্রত্যাশা করে? কলেজের একটি মেয়েকে সর্বসমক্ষে কয়েকজন অ্যান্টিস্যোশাল অপহরণ করে নিয়ে গেল। আর তুমি তোমার কর্তব্য শেষ করলে কলেজের কয়েকটি নিরীহ ছেলেকে গ্রেপ্তার করে, যারা নিরুপায় হয়ে মাঝসড়কে আর্তনাদ করছিল অথবা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করছিল?

জয়ন্ত নড়ে-চড়ে বসল। বলল, অ্যাবডাকশনের কথাটা আমিও শুনেছি, স্যার।

বাট ইট্স্ জাস্ট 'হেয়ার-সে'। শোনা কথা। কেউ থানায় এসে লিখিত এজাহার দেয়নি যে, কলেজের একটি মেয়েকে সর্বসমক্ষে অ্যাবডাক্ট্ করা হয়েছে।

তালুকদার রুখে ওঠেন, অ্যাজ ইফ কোন একজন এসে থানায় লিখিত এজাহার দিয়ে গেছিল যে, পটল, বাবু আর রহিম রাস্তায় মারামারি করছিল অথবা পুলিসের নিষ্ক্রিয়তায় আর্তনাদ করছিল।

জয়ন্ত নীরব রইল। একটু পরে বলল, ইজ দ্যাট অল, স্যার? আপনি ঐ তিনজনকে জামিনে খালাস করিয়ে নিয়ে যেতে চান, পার্সোনাল বন্ডে। তাই তো?

—হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। ঐ সঙ্গে আমি এফ. আই. আর. লিখে যেতে চাই ঐ অ্যাবডাকশান কেসটার। কলেজের গেট থেকে কলেজের একটি ছাত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে একটা অ্যামবাসাডার গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে কয়েকজন অ্যান্টিসোশাল।

—আপনি কি প্রত্যক্ষদর্শী?

—না, তবে তিন-তিনটি প্রত্যক্ষদর্শী আমার কাছে স্বীকার করেছে।

—তাদের সঙ্গে করে আনলেন না কেন, স্যার?

—প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি তো এসেছি শুধু এফ. আই. আর. লজ করতে। যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের নাম-ঠিকানা জানাব আমি। যদি তুমি মনে কর ট্যাক্স-পেয়ারদের স্বার্থে তোমার এনকোয়ারি করা উচিত, তাহলে তুমি গিয়ে তাদের এজাহার নেবে।

—যে মেয়েটি অ্যাবডাক্টেড হয়েছে তার নাম কী?

—কৃষ্ণা সেন। থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট। হাতিবাগানের কাছে থাকে। পুরো অ্যাড্রেস এফ. আই. আর.-এ জানাব।

—যারা অ্যাবডাক্ট করেছে তাদের কারও নাম কি আপনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানেন?

—না, পরোক্ষজ্ঞানে জানি। আমার কাছে প্রত্যক্ষদর্শীরা স্বীকার করেছে, তাই জানি।

—কী নাম?

—লাল্টু অথবা লাল্লু ওস্তাদ!

জয়ন্ত টেবিলের উপর একটা কাগজচাপা নিয়ে অহেতুক কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, এক্সকিউজ মি, স্যার! এটা কি একটা পজিটিভ অ্যাকিউজেশন হল? গোটা নামটা বলতে পারছেন না, উপাধিটা জানেন না, এমনকি নামটাও জানেন না ভাল করে।

তালুকদার-সাহেব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, কোনও মফঃস্বল কলেজের পাস-কোর্সে পাশ করা গ্র্যাজুয়েট হলে তোমার অভিযোগটা ধোপে টিকত, জয়ন্ত।

কিন্তু তুমি যে-কলেজের ছাত্র তাতে আমি আশা করেছিলাম — এটাই যথেষ্ট ক্লু। আমি আশা করেছিলাম, তুমি তোমার এলাকার অ্যান্টিসোশালদের চেন। এনি ওয়ে, তুমি যদি সন্দেহজনক এ-পাড়ার কয়েকটি অ্যান্টিসোশালকে অ্যারেস্ট করতে পার তাহলে আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে আমার দুটি ছাত্রী এবং একটি ছাত্র অপরাধীকে চিহ্নিত করে দেবে। তখন জানা যাবে তার প্রকৃত নামটা কী ! আমি তো এখানে কোন লোকের নামে 'পজিটিভ অ্যাকিউজেশন' করতে আসিনি। এসেছি, একটা অভিযোগ জানাতে। একটা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করতে। বাকি কাজ তোমার।

জয়ন্ত তবুও ইতস্তত করে বললে, আপনি কি এফ. আই. আর. এ ঐ লাল্টু বিশ্বাসের নামটা উল্লেখ করতে চান ?

—বিশ্বাস ? লাল্টু বিশ্বাস ?

ও. সি. মনে মনে জিহ্বা দংশন করল কি না তা দেখতে পেলেন না, কিন্তু তার সামলে নেবার ব্যর্থ প্রয়াসটা অনুভব করলেন। ও. সি. বললে, আপনিই তো বললেন, লাল্টু না কী যেন বিশ্বাস !

—না, 'বিশ্বাস' উপাধিটা আমি বলিনি, তবে এফ. আই. আর এ লিখব। আমার বিশ্বাস, ওর উপাধিটা এতক্ষণে জানা গেছে।

ঠিক ঐ সময় টেলিফোনটা বেজে ওঠায় বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেল জয়ন্ত। তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করল। তারপর একতরফা অনেকগুলি কথা বলে গেল।

তালুকদার-সাহেব প্রথমদিকে খেয়াল করেননি, ওঁর মনে হয়েছিল জয়ন্তর কোনও উপরওয়ালা পুলিস-অফিসার কথা বলছেন ; কারণ প্রায় প্রতি বাক্যের শেষেই জয়ন্ত 'স্যার' বলছিল। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন যখন জয়ন্ত টেলিফোনে বললে, না স্যার, ঠিক এখনি যেতে পারছি না। আমি একটা এফ. আই. আর. লেখাচ্ছি...আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ কলেজের কেসটা নিয়েই...ইয়েস, স্যার ! কলেজের একজন প্রফেসার এসেছেন ওদের জামিনে ছাড়িয়ে নিতে...

তারপর অনেকক্ষণ কী যেন শুনে গেল। শেষে টেলিফোনের মাউথপিস-এ হাতচাপা দিয়ে প্রফেসার তালুকদারকে প্রশ্ন করে, মহিমবাবু লাইনে আছেন, আপনি কি, স্যার, ওঁর সঙ্গে এই কেস নিয়ে কথা বলতে চান ?

তালুকদার জানতে চান, মহিমবাবুটি কে ?

তাপস ওঁর কর্ণমূলে বললে, মহিম হালদার ! স্ট্যান্ডিং এম. এল. এ....

তালুকদার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

জয়ন্ত টেলিফোনে ও-প্রান্তবাসীকে বললে, নিন, স্যার, এবার প্রফেসার তালুকদারের সঙ্গে কথা বলুন।

ওর হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে তালুকদার বলেন, নমস্কার ! তালুকদার বলছি...

—নমস্কার, নমস্কার। কিন্তু এ-সব কী হচ্ছে প্রফেসার তালুকদার ? আপনাদের কলেজটা যে অ্যান্টিসোশালদের একটা আড্ডা হয়ে উঠছে !

তালুকদার হেসে বললেন, বলছেন ? কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে কলেজ-ক্যাম্পাসের বাইরে ; এবং অপরাধী কলেজের ছাত্র নয়।

—না, না, অপরাধটা কে করেছে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু জয়ন্ত যে বলল তিন-তিনটে ছেলেকে রাউডিজম্-এর জন্য ধরে এনেছে ?

—আজ্ঞে না, আমি সে-কেসটার কথা বলছি না। আমি বলছিলাম অ্যাবডাকশন কেসটার কথা।

—অ্যাব্ডাক্শন ! গুড হেভেন্স ! অ্যাব্ডাক্শন হল কখন ? কে ? কোথায় ?

—আপনি বরং ও. সি.র সঙ্গে কথা বলুন।

যন্ত্রটা উনি হস্তান্তরিত করেন।

জয়ন্ত সংক্ষেপে ওঁকে ব্যাপারটা জানাল। অপহৃতা মেয়েটির নাম জানালো। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর কথাও ; কিন্তু তালুকদার-সাহেব এজাহারে যে নামটা লিখবেন বলে কথা দিয়েছেন তার নামোল্লেখ করল না। ও-প্রান্তবাসীর কথা শোনা গেল না। জয়ন্ত শুনে নিয়ে 'কথা-মুখে' হাত চাপা দিয়ে পুনরায় বললে, উনি আপনার সঙ্গে আবার কথা বলতে চান।

—অলরাইট, দাও।

যন্ত্রটা আবার হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন।

মহিম হালদার ওঁকে অনুরোধ করলেন একবার তাঁর বাসায় আসতে। ব্যাপারটা গুরুতর। এখনি ব্যবস্থা করা দরকার।

তালুকদার বললেন, আমি একবার মেডিকেল কলেজে যাব এখান থেকে। আই মীন, এখানে যারা আটক আছে তাদের জামিনের ব্যবস্থা হয়ে গেলেই...

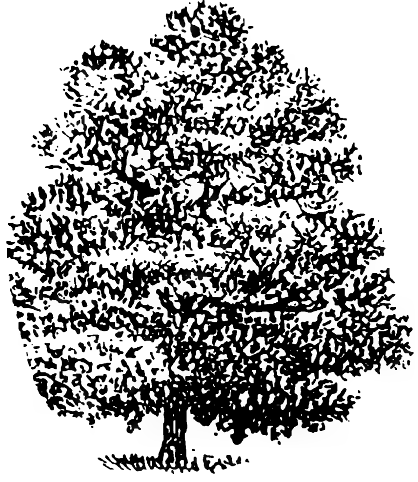
বাধা দিয়ে মহিম হালদার বললেন, না, না, জামিন-টামিন নয়। আমি জয়ন্তকে বলে দিচ্ছি, ওদের পার্মানেন্টলি ছেড়ে দিতে। পুলিস ওসব পেটি-কেস চালাবেই না। তাহলে কখন আপনি আসতে পারবেন ?

—অ্যাবাউট সাড়ে চারটে।

—দ্যাট সুট্স্ মি ফাইন, থ্যাঙ্ক য়ু।

তালুকদার জয়ন্ত চৌধুরীকে বললেন, ওঁর ঠিকানাটা...

তাপস আর সতীশ প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, আমরা চিনি।



থানা থেকে বেরিয়ে এসে তালুকদার-সাহেব বলেন, ওঠ গাড়িতে।

দুজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ফিরে এলেন কলেজের গেটে। সেখানে এখন কোনও উত্তেজনা নেই। যথারীতি যানবাহন আর পদাতিকের কসরৎ চলছে — কে কার আগে যেতে পারে। কে বলবে, তিন-চার ঘণ্টা আগে এই রাস্তায় একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, একটি যুবক ছুরিকাহত হয়েছে, আর একটি তরুণীর আর্ত কণ্ঠস্বরে ট্রাম রাস্তা মুখর হয়ে উঠেছিল ! সর্বসমক্ষে টানতে টানতে দুঃশাসনের দল তাকে টেনে নিয়ে গেছে মরণাতীত যন্ত্রণার নরকে !

কলেজ-গেট-এর কাছে এসে উনি গাড়িটা কার্ব ঘেঁষে দাঁড় করালেন। বললেন, আমি এবার একবার মেডিকেল কলেজে যাব। তোমরা কে কী করবে ?

সতীশ বলে, এখন তো ভিজিটিং আওয়ার নয়, আপনাকে যেতে দেবে ?

—দেবে। ওখানকার দু-একটি ডাক্তার আমার ছাত্র। সতীশ, তুমি বরং এখানে নেমে যাও। খোঁজ নিয়ে দেখ, জোয়াদ্দার এসেছে কিনা। ইতিমধ্যে। এসে থাকলে তাকে আপ্টুডেট খবরটা জানাও। আর প্রিন্সিপাল-সাহেবকেও জানিয়ে দিও যে, ছাত্র তিনজন হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে — জামিনে নয়, পুলিস আর তাদের বিরুদ্ধে কেস চালাবে না। কেমন ?

সতীশ গাড়ি থেকে নেমে গেল। তালুকদার তাপসকে নিয়ে আবার গোলদিঘিকে পাক মারলেন। পাঁচ-দশকের পুরাতন একটি সরবতের দোকানের সামনে এসে গাড়িটাকে থামালেন। উনি নিজে যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তেন তখন এখানে পাশাপাশি দুটি সরবতের দোকান ছিল — প্যারাডাইস আর প্যারাগন। তারই একটা ভগ্নাংশ আজও টিকে আছে। পড়ন্ত বেলায় এখন খদ্দের নেই। উনি তাপসকে নিয়ে পিছনের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। বললেন, তেষ্টাও পেয়েছে, আর তোমার সঙ্গে জরুরি কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।

একজন ছোকরা মতো দোকানের কর্মচারী এসে ফ্যানটা খুলে দিয়ে গেল।

তালুকদার ওকে দুটো 'মালাই' দিতে বললেন।

ছোকরা চলে যেতেই তাপস বলে ওঠে, আমারও একটা প্রশ্ন জানবার আছে, স্যার। আপনি অনুমতি দিলে সেটাই আগে পেশ করি।

—কর। প্রশ্ন করতে আর দোষ কি ? জবাব দেব কি না সেটা যখন আমার মর্জির উপর নির্ভর করছে। বল ?

—তিনটে কাগজের মধ্যে কটায় 'লালু বিশ্বাস'-এর নাম ছিল ?

—একটাতেও নয়। একটি কাগজে ইংরেজিতে লেখা ছিল এল্. এ. এল. টি. উ.। আর একটিতে এল. এ. এল. এল. ইউ.। আর তৃতীয় কাগজে 'নাম জানি না। তবে এ অঞ্চলের কুখ্যাত অ্যান্টিসোশাল। দেখলে চিনতে পারব।' — এই কথা কটা গোটা গোটা বাংলা হরফে লেখা।

—আপনি কি স্যার, ওকে দেখলে চিনতে পারবেন ?

—না। অ্যান্টিসোশালদের ছবি সংগ্রহ করার বাতিক আমার নেই।

তাপস জবাব দিল না। হাসল না পর্যন্ত। তার কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা পত্রিকা বার করে একটা পাতা মেলে ধরল।

তালুকদার দেখলেন, কী একটা ক্লাবের সেটা কালীপূজোর স্যুভেনির। তার প্রথম দিকে গোটা কতক আলোকচিত্র। পূর্ববৎসরের প্রাক-পূজা অনুষ্ঠানের। ছবিগুলি 'গুণীজন সম্বর্ধনা'-র। কয়েকজন প্রখ্যাত খেলোয়াড়, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে পর-পর ছবিতে, একই মন্ত্রীমশায়ের হাত থেকে স্মারক-সম্মান গ্রহণ করতে। প্রতিটি আলোকচিত্রেই মন্ত্রীমশায়ের পাঁজর ঘেঁষে একজন স্বাস্থ্যবান যুবক দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় দেহরক্ষীর ভঙ্গিতে। তার পরনে জিনস-এর প্যান্ট, উর্ধ্বাঙ্গে গোল-গলা স্পোর্টস্ গেঞ্জি, মাজায় চওড়া বেল্ট। গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাথায় পাখির বাসার মতো সযত্নবিন্যস্ত কেশচূড়।

তাপস তার তর্জনীটা ঐ ছেলেটির বুকের উপর চেপে ধরে বললে : এই হচ্ছে লাল্টু বিশ্বাস।

দোকানের ছেলেটি দু গ্লাস সরবৎ হাতে এগিয়ে আসছিল। তালুকদার নিঃশব্দে তাপসের হাত থেকে পত্রিকাটা নিয়ে অ্যাটাচি-কেসে ভরে ফেললেন। গ্লাস দুটো নামিয়ে রেখে ছেলেটি চলে যেতেই তালুকদার প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণাকে কেন ওরা ধরে নিয়ে গেল, তা জান ?

—জানি, স্যার। বলছি শুনুন।

তাপস ওঁকে জানালো কৃষ্ণা সেন একজন নামকরা ছাত্র নেত্রী। তাপসদের ইউনিয়নের। ফলে লাল্টুর বিরুদ্ধ পার্টির। লাল্টু অবশ্য ছাত্র নয়। সে পার্টি-ক্যাডারদের নেতা। প্রয়োজনে কখনো বা কলেজের ছাত্র-রাজনীতিতে অংশ নেয়।

যদি কাউকে 'ধোলাই' দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অথবা 'হাফিজ' করার। কিছুদিন আগে কৃষ্ণার সঙ্গে লালটুর রাজনৈতিক দলের একটা ছেলের বচসা হয়। ওরা দাবী করেছিল ওদের কী একটা ফাংশনে কৃষ্ণাকে গান গাইতে হবে। কৃষ্ণা সম্মত হয়নি। বচসার সময় ও দলের একটি ছেলে কৃষ্ণার গায়ে হাত দেয়। আর কৃষ্ণা তাকে একটা চড় মারে। ফলে একটা হাতাহাতির সূত্রপাত হয়। ঘটনাচক্রে সে সময় ওরা দলে ভারী ছিল না। মার খেয়ে পালায়। তাপসের আশঙ্কা, তারপর ওরা ওদের পার্টি-মস্তান লালটুর শরণ নেয়। তা থেকেই এই পরিণতি।

তালুকদার জানতে চান, কৃষ্ণা যে ছেলেটিকে চড় মেরেছিল তা কেউ দেখেছে ?

—কী বলছেন স্যার ? ঘটনাটা ঘটে কমনরুমের সামনে। অন্তত দশ-বিশজন সাক্ষী আছে। তবে আপনি যা ভাবছেন তা হবার নয় ?

—কী ভাবছি আমি ?

—যদি কোনও এনকোয়্যারি হয়, অথবা আদালতে সাক্ষী দেবার প্রয়োজন হয় তবে প্রত্যক্ষদর্শী একটাও পাবেন না।

—ঐ মস্তান লালটু বিশ্বাসের ভয়ে ?

তাপস কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, ওর নামে কতগুলো কেস ঝুলছে তার হিসাব বোধকরি লালটু নিজেই জানে না। প্রয়োজনও হয় না। সে হিসাব রাখবার জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আইন-মোতাবেক মাহিনা-করা ব্যবস্থা করেন। একাধিক খুন, ডাকাতি, রাহাজানি এবং রেপ-কেস-এর নায়ক বুক ফুলিয়ে মটোর সাইকেলে চেপে সারা শহর চষে বেড়োয়। গুণীজন-সম্বর্ধনার আসরে সেজে-গুজে মন্ত্রীমশায়ের পাঁজর ঘেঁষে দাঁড়ায়। ওকে অসংখ্যবার পুলিসে ধরেছে—না ধরে উপায় নেই বলেই ধরেছে—চক্ষুলজ্জার খাতিরে, সংবাদপত্রের হুড়ো খেয়ে যখন ধরতে বাধ্য হয়েছে—কিন্তু প্রতিবারেই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কলকাঠি নাড়ায় জামিন পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

—তারপর ? আদালতে কেস ওঠে না ?

—আজ্ঞে না। তারিখের পর তারিখ পড়ে। যতদিন না প্রত্যক্ষসাক্ষীদের কব্জা করা যায়। লোভে পড়ে অথবা ভয়ে,তারা সরে দাঁড়ায়। আদালতের হাজার-হাজার পেন্ডিং-কেস-এর কিছু সংখ্যাবৃদ্ধি হয় মাত্র। তারপর সবাই সে কথা ভুলে যায়। লালটু বুক ফুলিয়ে মটোর সাইকেলে ঘুরে বেড়ায় !

তালুকদার-সাহেবের মনে হল : সবাই কি ভোলে ? যে মায়ের জোয়ান ছেলেটা হারিয়ে গেল, যে বিধবার স্বামী আর কোনদিন বাড়ি ফিরে আসবে না, তারাও কি ভুলতে পারে ? আর ঐ হতভাগিনীর দল — যাদের সর্বনাশ করে মস্তান পার্টি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় ? যারা লোকসমাজে মুখ তুলে আর তাকাতে পারে না। পাছে

কেউ পার্শ্ববর্তীর কানে-কানে বলে, হ্যাঁরে, সেই মেয়েটাই !

ওঁর মনে পড়ে গেল, ভাগলপুর জেল-এর একটা ঘটনার কথা। কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে পড়েছিলেন। পড়ে শিউরে উঠেছিলেন। জেলে বিচারাধীন তিনজন আসামীকে পুলিস-হেপাজতে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ! কী নৃশংস কাণ্ড ! অবশ্য তার সাতদিনের মধ্যেই অপরাধী পুলিস — ঐ যারা অন্ধ করেছিল — তাদের সাসপেন্সনের অর্ডার এসে যায় উপরমহল থেকে। মায় জেলার স্বয়ং সাস্‌পেন্ডেড !

সবচেয়ে অবাক করা খবর : ভাগলপুরের মানুষ ঐ আদেশনামার প্রতিবাদ করতে সর্বাত্মক হরতাল করে বসল! কোনও রাজনৈতিক দলের ডাকা বন্ধ নয়। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করছে ! স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত, দোকান-পাট সব বন্ধ ! কী চায় গোটা ভাগলপুরের মানুষ ? ওরা চায় ঐ পুলিস-অফিসারদের উপর যে সাস্‌পেন্সন অর্ডার দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে !

কী আশ্চর্য ! কেন ? কেন ? কেন ?

এমন নৃশংস পুলিস-নির্যাতনের.....

সাংবাদিক তদন্ত করে জানালেন : বিচারাধীন আসামীদের প্রত্যেকের নামে দশ-বিশটা খুন আর ডাকাতির কেস ঝুলছিল। এক-একজন বিশ-ত্রিশ-চল্লিশটা রেপ-কেস্‌-এর আসামী। বিশ্বাস করা কঠিন, তাই নয় ? একটা মানুষ অভাবের তাড়নায় বিশবার ডাকাতের দলে নাম লেখাতে পারে, কিন্তু বিশবার বলাৎকারের বীভৎসতায় গা ভাসানোর বিলাস হয় কেমন করে ? খোঁজ নিয়ে দেখ, ওদের ঘরে আছে শয্যাসঙ্গিনী। অথবা যারা অর্থের বিনিময়ে দেহদান করে তাদের সঙ্গে আঁতাত ! কিন্তু না ! তাতে ওদের তৃপ্তি হয় না। রমণীর আর্তনাদেই ওদের পৈশাচিক তৃপ্তি ! বীভৎস ওদের রুচি — যাকে বলাৎকার করবে তার স্বামী-সন্তান অথবা সহোদরকে পিঠমোড়া করে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখবে, চোখের সামনে !

তবেই না মজা। হি-হি ! হো-হো !

সাংবাদিক অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন : ঐ তিনজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী দশ-বারো বছর ধরে ভাগলপুরে তাদের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিত্তবানেরা, ব্যবসায়ীরা মাস-মাস ওদের 'তোলা' দিয়ে যায়, অর্থাৎ মাসিক চাঁদা — বিনিময়ে এরা প্রতিশ্রুতি দেয় ওদের 'গদি'তে, বাড়িতে বা দোকানে এরা ডাকাতি করবে না, ওদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূকে তুলে নিয়ে যাবে না। এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে সবাই মেনে চলতে বাধ্য হয়েছিল, অপ্রতিবাদে। পুলিসের কিছু করার ছিল না।

হেতুটা সহজবোধ্য। ঐ তিনজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী ছিল এমন লোকের পোষা গুণ্ডা, যারা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তারা শাসক-সম্প্রদায়ের চূড়ামণি — এম. এল. এ., এম. পি., মন্ত্রী, মায় মুখ্যমন্ত্রী ! শাসক-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা দখলের লড়াই-

ভাগাড়ে তারা শকুনির মতো টানাটানি-ছেঁড়াছেড়ি করে। এই তথাকথিত 'দেশসেবক গুন্ডা'দের পৃষ্ঠপোষকতাতেই 'অপরাধজীবী'রা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। হ্যাঁ, এরা অপরাধজীবীই। নিরুপায় পুলিসের জ্ঞাতসারে। অথবা সহযোগী পুলিসের ! কখনো-কখনো অপরাধজীবীরা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে — কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রভাবশালী 'দেশসেবকেরা' হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন—ওরা জামিনে ছাড়া পেয়েছে !

জনশ্রুতি, ভাগলপুরের জেল-এর জেলার ছিলেন ভিন্ন জাতের পুলিস-অফিসার। লোভে লালায়িত হওয়া অথবা ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু কিছু করার নেই। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত জেলর-সাহেব নাকি একবার ক্ষেপে উঠে ওদের একজনকে বলেছিলেন, তোকে মেরে এই জেলের ভিতরেই পুঁতে ফেলব, শয়তান !

লোকটা ভাগলপুরী দেহাতি-খিস্তি মিশিয়ে জবাবে বলেছিল, সেটা তোর হিম্মতে কুলাবে না রে পুলিসের বাচ্চা ! জেলের ভেতর আমার মৌত মানে তোর জরু-গরুও ফৌত ! তোকে ফাঁসি কাঠ থেকে না ঝুলিয়ে থামবে না ঠাকুর-সাহেব ! না কী বলিস রে ভগ্‌লু ভেইয়া ?

ওর পাপের সাথী ঠাকুর-সাহেবের আরেকজন পোষা কুত্তা ভগ্‌লু অট্টহাসে ফেটে পড়েছিল। বলেছিল, তব্ শুন লে রে জেলার-সাহব ! তোক্‌রা হিসাব হ্যয় নু,কি মেরা উনতালিশঠো কেস হো চুকা ? অব শুন......

অর্থাৎ, শোন, রে জেলার-সাহেব। তুই তো জানিস আমার নামে উনচল্লিশটা রেপ্-কেস্ আছে। তাই না ? লেকিন তুই যেটা জানিস না সেটা শুনে রাখ। 'চালিশবারে'র জন্য কোন মন্‌পসন্দ্‌কে চুনাও করে রেখেছি। বড়ি খুবসুরৎ ! উমর কেৎনা ভইল রে জেলার সা'ব ? আঠারা বহ্ বিশ ?

দাঁতে-দাঁত দিয়ে জেলার বলেছিলেন, কার কথা বল্‌ছিস ?

—তেরি লেড়কি কি। কলেজমে সে পড়তি হ্যয় নু ?

দুরন্ত ক্রোধে স্থান-ত্যাগ করেছিলেন জেলার সাহেব।

ওরা তিনজন অট্টহাস্য করে উঠেছিল তাঁর পলায়নের ভঙ্গিটায়।

কিন্তু ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি।

জেলার পালিয়ে যাননি আদৌ। মনস্থির করেছেন ততক্ষণে। বুঝতে পেরেছেন ; এ-ছাড়া তাঁর ফুলের মতো নিষ্পাপ আত্মজার ধর্মরক্ষা করা অসম্ভব। হ্যাঁ, কলেজেই পড়ে — ভাগলপুর কলেজে — সুবো-সাম লেডিজ-সাইকেলে চেপে ভাগলপুর কলেজে যেতে হয় তাকে। ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর প্রভাবে ঐ তিনটে নরপিশাচ জামিনে খালাস পাবেই। আর তখন তারা প্রতিশোধ নেবে নির্ঘাৎ ! মেয়েটিকে মাঝপথ থেকে তুলে নেওয়া ওদের কাছে ছেলেখেলা। উনতাল্লিশ সে চালিস ! ক্যা ফারক ?

জেলারকে মদত দিতে এগিয়ে এল আরও পাঁচ-সাতজন পুলিস। তারাও নানান

কারণে অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলছিল। প্রতিশোধস্পৃহায় তারাও ছিল আগ্নেয়গিরি !

তিন-তিনটে আসামী জেলের ভিতর অন্ধ হয়ে গেল !

না, জেলর-সাহেবের উপর থেকে সাস্‌পেন্‌শন-অর্ডার প্রত্যাহার করা হয়েছিল কি না তা আর জানেন না তালুকদার-সাহেব। কিন্তু এটুকু জানেন, তাঁর ঐ বে-আইনি কাজটা শতকরা শতভাগ সমর্থন পেয়েছিল ভাগলপুরবাসীদের কাছ থেকে।

না, এবারও হিসাবে ভুল হয়। শতকরা শতভাগ নয়। কয়েকজন উচ্চকোটির 'ষড়যন্ত্রী-মশাই' ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ঐ অপরাধব্যবসায়ীরা ছিল যে-কয়জন মুষ্টিমেয় রাজনীতিব্যবসায়ীর পোষাগুণ্ডা। কিন্তু ক্ষমতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত ঐ মন্ত্রীমশাইদেরও কিছু করার ছিল না। অবিমৃষ্যকারী জেলারের কেশস্পর্শ করলে আগামী 'চুনাও'-য়ের সময় গোটা ভাগলপুর অঞ্চলের কয়েক লক্ষ ভোট হারাতে হবে !

জেলার-সাহেব বদলি হয়ে গেছিলেন নিশ্চয় — ঠিক জানেন না। কিন্তু এটুকু আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না তাঁর সেই অষ্টাদশী আত্মজাটি একদিন কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছিল — দু-হাতে মেহ্‌দির ছাপ নিয়ে একদিন ছাঁদনা-তলায় অবাক চোখে তাকিয়ে দেখেছিল তার দুলহন-এর দিকে।

এতদিনে বোধকরি সে সোনার চাঁদ খোকার-মা !

কৃষ্ণার কি সে সৌভাগ্য হবে ?





হাসপাতাল সেরে মহিম হালদারের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছালেন তখন পড়ন্ত বিকাল। সাড়ে চারটে। বাড়ির সামনে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে। অ্যামবাসাডার, মারুতি, মায় একটি মার্সেডিজ। মহিমবাবু একাধিকবার চুনাওয়ে জয়ী হয়েছেন। দশবছর আগে ইঁটের পাঁজরা বার করা যে একতলা পৈত্রিক বাসভবনে এই রাজনীতির ব্যবসা শুরু করেন, পর-পর দুবার দেশসেবার অধিকার পেয়ে সে বাড়ি আজ ত্রিতল। একতলায় বেশ বড় একটা হল-কামরা। ব্যারিস্টার বা পশারওয়ালা ডাক্তারদের যেমন থাকে। সামনের দিকে একটি প্রতীক্ষাগারে সোফা-সেটি-চেয়ার, বেঞ্চি। আর তার পরে অটোমেটিক ডোর-ক্লোজার লাগানো টীক-প্লাই-এর ফ্লাশ-পাল্লার আড়ালে বাতানুকূল-করা সাহেবের চেম্বার — থুড়ি, এক্ষেত্রে 'দাদা'র খাশ-কামরা।

গাড়ি পার্ক করে তালুকদার-সাহেব তাপসকে নিয়ে প্রবেশ করলেন বাইরের ঘরে। একাধিক সাক্ষাৎপ্রার্থী অপেক্ষা করছে। বাঙালি এবং অবাঙালি। উনি এক ধারে গিয়ে বসলেন। তাপস একই সোফায় বসতে ইতস্তত করছিল। উনি হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন।

একটি লক্কা-পায়রা-মার্কা ছেলে এসে বাড়িয়ে ধরল ছাপানো স্লিপ বুক। তালুকদার মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

তাপস হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম জানালো : 'প্রফেসার আর. তালুকদার'। প্রয়োজনের ঘরে : 'অ্যাজ আপয়েন্টেড'।

ছেলেটি কাগজটা নিয়ে ভিতরে গেল।

পরমুহূর্তেই ফ্লাশ-পাল্লাটা খুলে গেল। দুজন যুবক বার হয়ে এল। ডানে-বাঁয়ে তাকালো না। সোজা বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ওদের ভিতর একজনকে চিনতে পারলেন তালুকদার-সাহেব। ঐ ছেলেটির ফটোই আছে তাঁর অ্যাটাচি-কেসে। এখন জিন্স্-এর প্যান্ট নয়, গোল-গলা স্পোর্টস্ গেঞ্জিও নেই গায়ে, কিন্তু মাথার উপর পাখির

বাসাটি আছে অবিক্ষত। উনি তাপসের দিকে আড়চোখে তাকালেন। তাপসের ঘাড় সোজাই রইল। শুধু চোখ জোড়া ইঙ্গিতপূর্ণভাবে একবার বন্ধ হয়ে খুলে গেল।

একটু পরে এল সেই লক্কা-পায়রা। তালুকদারের কাছাকাছি এসে বললে, আসুন স্যার, দাদা আপনাকে ভিতরে যেতে বললেন।

সাত-আট জোড়া চোখ—ঐ যাঁরা প্রতীক্ষায় বসে আছেন, খোদায় মালুম কতক্ষণ ! —ওঁর উপর পড়ল। তালুকদার ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তাপসকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে গেলেন। খাশ-কামরার ভিতর। লক্কা-পায়রাও এল পিছন-পিছন।

—আসুন, আসুন, প্রফেসর তালুকদার। ওদের কেমন দেখে এলেন ?

—ওদের ? মানে কাদের ?

—আপনি তো মেডিকেল কলেজ থেকেই আসছেন ?

—ও হ্যাঁ। মোটামুটি ভালই আছে। তবে স্ট্যাব-কেসটা একটু গোলমেলে। জ্ঞান হয়নি এখনো।

—আজ্ঞে না। দেবু স্ট্রং সিডেটিভে আছে। ডাক্তারবাবু তো তাই বললেন টেলিফোনে।

অর্থাৎ মহিম হালদার খোঁজ-খবর ঠিকই রাখছেন।

হঠাৎ তাপসের দিকে তাকিয়ে বলেন, এ ছেলেটি কে ? ঠিক চিনতে পারছি না তো ?

—আমাদের কলেজেরই। একজন ছাত্রনেতা। তাপস...।

—অ। তা ভাই তাপস, তুমি একটু ও-ঘরে গিয়ে বস। আমি প্রফেসার তালুকদারের সঙ্গে জনান্তিকে কিছু...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ও-ঘরে অপেক্ষা করছি।

তাপস বেরিয়ে যায় শশব্যস্তে।

মহিম হালদার এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, শুনুন প্রফেসর তালুকদার...

প্রফেসর তালুকদার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, দাঁড়ান শুন্‌ছি। এ ছেলেটি কে ? ঠিক চিনতে পারছি না তো ?

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লক্কা-পায়রাটিকে দেখিয়ে দেন।

—ও, মানে আমার ছোট ভাইয়ের মতো। সেক্রেটারি আর কি। অনেকদিন ধরে কাজ করছে। পার্টি-ক্যাডার। তপেন...

—অ। তা ভাই তপেন, তুমি একটু ও-ঘরে গিয়ে বস। আমি ওঁর সঙ্গে জনান্তিকে কিছু বলতে চাই...

মহিম হালদার ঝানু লোক। ঢোক গিললেন তিনি। তাঁর সঙ্গে চোখে-চোখে কথা

হল তপেনের। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

এবার তালুকদার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, বলুন?

—প্রথম কথা মেয়েটি এখনো আনট্রেস্‌ড্। মিনিট-দশেক আগেও আমি টেলিফোনে কথা বলেছি ডঃ সেনের সঙ্গে—

—ডঃ সেন কে?

—ডঃ অপরেশ সেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। কৃষ্ণার বাবা। কৃষ্ণার মা নেই। বাড়িতে আছেন বাবা, এক ভাই আর ছোট বোন। ডঃ সেন জানাচ্ছেন, মেয়ের কোন হদিসই পাননি। আমি আই. জি. ক্রাইমকে টেলিফোনে ব্যাপারটা জানিয়েছি। সমস্ত পুলিস স্টেশনকে অ্যালার্ট করা হয়েছে... যে কোন মুহূর্তে সেই কালো অ্যামবাসাডারটা ধরা পড়তে পারে...

—তা পারে। আবার নাও পারে। কিন্তু আমাকে আপনি দেখা করতে বলেছিলেন কেন? কী পরামর্শ করতে?

—ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিতে। কেমন চরিত্রের মেয়ে সে? আপনি কিছু জানেন? শুনেছি, জলসায়-জলসায় গান গেয়ে বেড়াতো?

প্রফেসার তালুকদার সে-কথার জবাব না দিয়ে একটি প্রতিপ্রশ্ন পেশ করেন, জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে কি এর মধ্যে আপনার যোগাযোগ হয়েছে, আমি এফ. আই. আর. লজ করার পর?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—সে কি বলেনি, আমি একজন সন্দেহভাজন অ্যান্টিসোশালের নাম লিখেছি?

—হ্যাঁ, তাও বলেছে। পুরো নামটা জানেন না, আন্দাজে কী দু-তিনটে নাম...

—তাই হয়, মিস্টার হালদার। অ্যান্টিসোশালদের একাধিক নাম থাকে। এক-এক এলাকায় এক-একটা। আমি যার কথা বলছি...

হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে উনি অ্যাটাচি-কেসটা খুলে কালীপূজার স্মারক পত্রিকাখানা বার করে আনেন। ছবিটা ওঁর টেবিলে মেলে ধরে বলেন, এই ছেলেটির কথা আমি বলতে চাই — কেউ ওকে জানে লাল্টু নামে, কেউ লাল্লু, কেউ শুধুই মস্তান। ছেলেটিকে চেনেন?

মহিম হালদার তৈরি ছিলেন। বললেন, আমিও এমনটা আশঙ্কা করছিলাম। এ একটা সাজানো কেস। কৃষ্ণা সেন আদৌ অপহৃতা হয়নি। আমাদের একজন অ্যাক্‌টিভ পার্টি ক্যাডারকে ফাঁসানোর জন্য গোটা কেসটা সাজানো। আপনি যে ছেলেটিকে নির্দেশ করছেন ওর নাম লাল্‌টুও নয়, লাল্‌লুও নয়, লালমোহন বিশ্বাস। ওকে ফাঁসানোর জন্য এর আগেও এভাবে কেস-সাজানো হয়েছিল। ভাড়া-করা প্রত্যক্ষদর্শীরা ভিড় করে এসেছিল থানায় এজাহার দিতে। তবে এবার ওদের চালে

একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, প্রফেসার তালুকদার। শুনুন...

মহিম হালদার জানালেন, তিনি সকালে তাঁর নিজস্ব গাড়ি নিয়ে বারাসত গিয়েছিলেন। সকাল ছয়টার ওঁরা রওনা হন, ফিরে আসেন একটার সময়। গাড়িতে ওঁর সঙ্গে ছিলেন জগৎ বাবু, বিশু মৌলিক, ওঁর পুত্র এবং ঐ লালমোহন বিশ্বাস। অ্যাবডাকশন — তা সে সাজানো-কেস হোক বা সত্যিকারের — ঘটে সকাল দশটায়। সে সময় লালমোহন বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবে বারাসতে একটা স্থানীয় পার্টি-মিটিঙে অংশ নিচ্ছে। এম. এল. এ. মহিমবাবুর চোখের সামনে ! আরও সাত-আটজন পার্টি-মেম্বারদের চোখের সামনে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্রফেসার তালুকদারের।

তারপর বললেন, ঐ লালমোহন বিশ্বাস-মশাই কি মিনিট-পাঁচেক আগে এই ঘরে ছিলেন ? আমি এ-ঘরে ঢোকার আগে ?

মহিমবাবু হেসে বলেন, 'বিশ্বাস-মশাই' বলার দরকার নেই, ও আপনার ছেলের বয়সী। হ্যাঁ, ছিল।

—তা হোক। লাল্লুবাবু আপনাদের পার্টির সম্মানিত কর্মী তো বটেন !

মহিমবাবু গুম খেয়ে যান।

তালুকদার উঠে দাঁড়ান। বলেন, আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী অনেক-অনেকজন বসে আছেন দেখলাম। অযথা আপনার সময় আর নষ্ট করব না। চলি তাহলে, নমস্কার।

মহিমবাবু জবাব দিলেন না। হাত দুটি জোড় করলেন মাত্র।

বাইরে এসে তাপসকে নিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। গাড়িতে উঠে বললেন, কৃষ্ণার বাবা ডাক্তার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তার অপরেশ সেন।

তালুকদার বলেন, তাপস, আমি বড় ক্লান্ত বোধ করছি। দৈহিক যতটা তার চেয়ে মানসিক। 'কুয়ো ভাদিস' ! কোথায় যাচ্ছি আমরা ? শোন, আমার বোধহয় একবার ডক্টর সেনের সঙ্গে দেখা করা, উচিত ছিল ...

বাধা দিয়ে তাপস বলে ওঠে, স্যার ! আমাদের কলেজে কতজন অধ্যাপক আছেন তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। সারাদিন না খেয়ে-দেয়ে পেট্রোল পুড়িয়ে কে আপনার মতো সারাটা শহর চষে বেড়াচ্ছে বলুন ? আপনি ফিরে যান। আমি কৃষ্ণার বাবার সঙ্গে দেখা করে যাব।

—তাঁকে আমার ফোন নাম্বারটা দিও। আর বল, কৃষ্ণার কোন খবর পেলেই যেন আমাকে জানান।



মঙ্গলবার সকালের দিকে ওঁর তিনটে ক্লাস থাকে। বিকালটা অফ্। দুপুর নাগাদ ফিরতে পারবেন। কলেজে এসে খবর পেয়েছেন, মেডিকেল কলেজে তিনটি রুগীই ভালোর দিকে। কৃষ্ণা সেনের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর গতকাল যে তিনটি ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা সবাই ছাড়া পেয়ে গেছে। পুলিস কেস চালাবে না।

ছাত্র ইউনিয়েনের কিছু একটা হয়েছে। থমথমে ভাব। ধর্মঘট ঘোষণা করেনি কোন পক্ষই, কিন্তু সব বিভাগেই উপস্থিতির হার খুবই কম।

বেলা তিনটে নাগাদ ডেকে পাঠালেন তাপসকে। জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার বল তো ? কলেজে এমন থমথমে ভাব কেন ? একটা ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিকই আন্দাজ করেছেন। উপরওয়ালাদের ইন্টারপ্রিটেশন জোয়াদ্দার মেনে নিতে পারছে না। একটা বিস্ফোরণ আশঙ্কা করছি।

—কিসের ইন্টারপ্রিটেশন ?

—পার্টি লাইনের বক্তব্য, কৃষ্ণা সেন একটা সাজানো অ্যাবডাকশনের নাটকে অভিনয় করে আত্মগোপন করেছে। পার্টির একজন দক্ষ ক্যাডারকে ফাঁসানোর জন্য। জোয়াদ্দার কেন, তার দলের অনেকেই এই থিয়োরিটা মেনে নিতে পারছে না। সাজানো অ্যাবডাকশন কেস-এ অমনভাবে কেউ কারও তলপেটে ছুরি মারে না। ওভাবে বোমা ছোঁড়ে না ! ফলে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের একটা মতপার্থক্য হয়েছে। জোয়াদ্দার আর তার দলের কয়েকটি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছাত্রনেতা এখন 'বিক্ষুব্ধ' গোষ্ঠীভুক্ত !

—যা হোক। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা জরুরি কথা জানাতে। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র তিনটে দিন আমি ছুটি নিয়েছি—

—কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন, স্যার ?

—না, বাড়িতেই থাকব। তুমি টেলিফোনে আমাকে পোস্টেড রেখ। শনিবার আমার সাপ্তাহিক ছুটি। একেবারে পরের সোমবার আবার কলেজে আসছি।

—ঠিক আছে, স্যার।

ওকে বিদায় করে উনি বেড়িয়ে পড়লেন মার্কেটিঙে।

সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এভাবেই কলেজ-ফের্তা তিনি কিনে নিয়ে যান। ধর্মতলায় ওঁর একটি ছাত্রের দোকান আছে। সেই দোকানের সামনে গাড়ি রেখে, তাকে সজাগ করে চাঁদনি-বাজারে ঢুকলেন। প্রথমেই খরিদ করলেন একটা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ। তারপর নানান টুকিটাকি জিনিস কিনে ঐ ব্যাগে ভরতে থাকেন : হেয়ার-অয়েল, টুথপেস্ট, শেভিং-ক্রীম, ভিম পাউডার, ন্যাপথলিন। মাঝারি-সাইজ একটা স্টীলের ক্যাশবাক্সও কিনলেন। সাবধানী মানুষ — দশ বা বিশ টাকার নোটে পঁচিশ হাজার টাকা বড় কম জায়গা নেবে না। কাগজের প্যাকেটে বেঁধে নিয়ে যেতে চান না উনি। আরও কিনলেন টর্চের এক-জোড়া ব্যাটারি, কিছু ফিউজ তার। খোদায় মালুম—কী মনে করে ঝালাই-কাজের কিছুটা 'সলডারিং' লোহা। তা-ছাড়া একটা স্প্রিং দেওয়া মজবুত ইঁদুর-মারা-কল। কেন ? ওঁর বাড়িতে তো ইঁদুরের উপদ্রব নেই ?

সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলেন বাড়িতে।

বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র তিন-তিনটে দিন ছুটি নিয়ে এসেছেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে এ ক'দিন কী করলেন তা উনিই জানেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা করতে এল তাপস। অনেক খবর সে এনেছে। দেবু ছাড়া বাকি দুজন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। দেবুর অবস্থা অনেক ভাল। পরের সপ্তাহে সে বাড়ি যাবে। তবে এখনো দু-এক সপ্তাহ তাকে শুয়েই থাকতে হবে। দেবুর কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা হয়েছিল — কৃষ্ণার খবরটা। কিন্তু সে জেনে ফেলেছে। উপায় নেই। আর একটা বড় খবর হচ্ছে জোয়াদ্দার রিজাইন দিয়েছে। সে সদলবলে এখন বিক্ষুব্ধের দলে। সতীশকে বোধহয় এবার ওরা ইউনিয়নের সেক্রেটারি করতে পারে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে : কৃষ্ণা সেন বাড়ি ফিরে এসেছে।

—এসেছে ? কখন ? কীভাবে ?

—কাল রাত তিনটেয়। একটা কালো অ্যামবাসাডারে।

বিচিত্র ঘটনাচক্র। রাত আড়াইটে নাগাদ একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে দাঁড়ায় ডক্টর অপরেশ সেনের বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে আসে দু-তিনটি ছেলে। কল-বেল বাজায়। ওঁদের ঘুম ভেঙেছিল ঠিকই, কিন্তু সাড়া দিতে চাননি। কিন্তু ও-

পক্ষ বেপরোয়া। চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়ার আশেপাশের বাড়িতে আলো জ্বলে ওঠে। ডাক্তার সেন দ্বিতলের ঝোলা বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জানতে চান : এত রাত্রে কে তোমরা হল্লা করছ ?

—রুগী নিয়ে এসেছি, স্যার। দোর খুলুন !

—হাসপাতালে নিয়ে যাও। এত রাত্রে আমি রুগী দেখি না।

—রুগি যে আপনার সোনার চাঁদ মেয়ে গো ডাক্তার সা'ব। তার বডি নেবেন না ?

—বডি ?

—জিন্দা কি মুর্দা নেমে এসে স্বচক্ষে দেখুন —

লোকটার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। হয় অত্যধিক মদ্যপান করেছে, অথবা মদ্যপের অভিনয় করছে। আধো-অন্ধকারে দেখা যায় অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ষণ্ডামার্কা একজন তরুণ। কালো-রঙের চোঙা প্যান্ট তার পরিধানে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল আর একজন। সে ঊর্ধ্বমুখে আকাশকে সম্বোধন করে বললে, এ-পাড়ার কোনো সুয়োরের বাচ্চা যদি এখন টেলিফোন ছোঁয় তবে কাল সুর্যিডোবার আগেই তার লাস ফেলে দেব মাইরি। ...অ্যাই, অ্যাই, তোরা খড়খড়ি তুলে কী দেখছিস্ বে ? সার্কাস ?

গলির উল্টোদিকে একটা বাড়ির ভেনিশিয়ান খড়খড়ি পাল্লা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে কে একজন মুরুব্বি ভারি গলায় হুকুম দিল : কেন বেহুদ্দো ঝুট-ঝামেলা করছিস্ বে ? বডিটা রোয়াকে নামিয়ে দে, যে পয়দা করেছে সে সালা সমঝে নেবে জিন্দা না মুর্দা। ডাক্তার-মানুস্ এটুকু বুঝবে না ?

দু-তিনজন ধরাধরি করে একটা অচেতন নারী-দেহ রোয়াকে নামিয়ে দিল। তারপর ওরা ঐ গাড়ি চেপে চলে যায়।

ডক্টর সেন নেমে এসে মেয়েকে ঘরে তুলে নেন। না, মৃতদেহ নয়। অজ্ঞান হয়েছিল জোরালো ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোতে। বেলা দশটা নাগাদ তার ঘুম ভেঙেছে। তার আগেই একজন পরিচিত লেডি ডাক্তারকে দিয়ে ডক্টর সেন কৃষ্ণাকে পরীক্ষা করিয়ে ছিলেন। তার ঘুমন্ত অবস্থাতেই।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল ! স্টিচ্ দিতে হয়েছে !

জ্ঞান ফিরে আসার পর কৃষ্ণা কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি।

কিছু খায়নি পর্যন্ত !

তালুকদার নতনেত্রে শুনছিলেন এতক্ষণ। তাপস থামতেই চোখ তুলে তাকান, বলেন, তারপর ? ডক্টর সেন পুলিসকে জানিয়েছেন ?

—না, স্যার। তবে পুলিস খবর পেয়ে গেছে।

—সারা-দিন সারা-রাত সে অভুক্ত আছে ?

—হ্যাঁ, স্যার। শুধু তাই নয়, মৌনও। এখনো পর্যন্ত সে কোন কথা বলেনি

—না, বাড়িতেই থাকব। তুমি টেলিফোনে আমাকে পোস্টেড রেখ। শনিবার আমার সাপ্তাহিক ছুটি। একেবারে পরের সোমবার আবার কলেজে আসছি।

—ঠিক আছে, স্যার।

ওকে বিদায় করে উনি বেড়িয়ে পড়লেন মার্কেটিঙে।

সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এভাবেই কলেজ-ফের্তা তিনি কিনে নিয়ে যান। ধর্মতলায় ওঁর একটি ছাত্রের দোকান আছে। সেই দোকানের সামনে গাড়ি রেখে, তাকে সজাগ করে চাঁদনি-বাজারে ঢুকলেন। প্রথমেই খরিদ করলেন একটা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ। তারপর নানান টুকিটাকি জিনিস কিনে ঐ ব্যাগে ভরতে থাকেন : হেয়ার-অয়েল, টুথপেস্ট, শেভিং-ক্রীম, ভিম পাউডার, ন্যাপথলিন। মাঝারি-সাইজ একটা স্টীলের ক্যাশবাক্সও কিনলেন। সাবধানী মানুষ — দশ বা বিশ টাকার নোটে পঁচিশ হাজার টাকা বড় কম জায়গা নেবে না। কাগজের প্যাকেটে বেঁধে নিয়ে যেতে চান না উনি। আরও কিনলেন টর্চের এক-জোড়া ব্যাটারি, কিছু ফিউজ তার। খোদায় মালুম—কী মনে করে ঝালাই-কাজের কিছুটা 'সলডারিং' লোহা। তা-ছাড়া একটা স্প্রিং দেওয়া মজবুত ইঁদুর-মারা-কল। কেন ? ওঁর বাড়িতে তো ইঁদুরের উপদ্রব নেই ?

সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলেন বাড়িতে।

বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র তিন-তিনটে দিন ছুটি নিয়ে এসেছেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে এ ক'দিন কী করলেন তা উনিই জানেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা করতে এল তাপস। অনেক খবর সে এনেছে। দেবু ছাড়া বাকি দুজন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। দেবুর অবস্থা অনেক ভাল। পরের সপ্তাহে সে বাড়ি যাবে। তবে এখনো দু-এক সপ্তাহ তাকে শুয়েই থাকতে হবে। দেবুর কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা হয়েছিল — কৃষ্ণার খবরটা। কিন্তু সে জেনে ফেলেছে। উপায় নেই। আর একটা বড় খবর হচ্ছে জোয়াদ্দার রিজাইন দিয়েছে। সে সদলবলে এখন বিক্ষুব্ধের দলে। সতীশকে বোধহয় এবার ওরা ইউনিয়নের সেক্রেটারি করতে পারে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে : কৃষ্ণা সেন বাড়ি ফিরে এসেছে।

—এসেছে ? কখন ? কীভাবে ?

—কাল রাত তিনটেয়। একটা কালো অ্যামবাসাডারে।

বিচিত্র ঘটনাচক্র। রাত আড়াইটে নাগাদ একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে দাঁড়ায় ডক্টর অপরেশ সেনের বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে আসে দু-তিনটি ছেলে। কল-বেল বাজায়। ওঁদের ঘুম ভেঙেছিল ঠিকই, কিন্তু সাড়া দিতে চাননি। কিন্তু ও

পক্ষ বেপরোয়া। চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়ার আশেপাশের বাড়িতে আলো জ্বলে ওঠে। ডাক্তার সেন দ্বিতলের ঝোলা বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জানতে চান : এত রাত্রে কে তোমরা হল্লা করছ?

—রুগী নিয়ে এসেছি, স্যার। দোর খুলুন!

—হাসপাতালে নিয়ে যাও। এত রাত্রে আমি রুগী দেখি না।

—রুগি যে আপনার সোনার চাঁদ মেয়ে গো ডাক্তার সা'ব। তার বডি নেবেন না?

—বডি?

—জিন্দা কি মুর্দা নেমে এসে স্বচক্ষে দেখুন —

লোকটার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। হয় অত্যধিক মদ্যপান করেছে, অথবা মদ্যপের অভিনয় করছে। আধো-অন্ধকারে দেখা যায় অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ষণ্ডামার্কা একজন তরুণ। কালো-রঙের চোঙা প্যান্ট তার পরিধানে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল আর একজন। সে ঊর্ধ্বমুখে আকাশকে সম্বোধন করে বললে, এ-পাড়ার কোনো সুয়োরের বাচ্চা যদি এখন টেলিফোন ছোঁয় তবে কাল সুর্যিডোবার আগেই তার লাস ফেলে দেব মাইরি। ...অ্যাই, অ্যাই, তোরা খড়খড়ি তুলে কী দেখছিস্ বে? সার্কাস?

গলির উল্টোদিকে একটা বাড়ির ভেনিশিয়ান খড়খড়ি পাল্লা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে কে একজন মুরুব্বি ভারি গলায় হুকুম দিল : কেন বেহুদো ঝুট-ঝামেলা করছিস্ বে? বডিটা রোয়াকে নামিয়ে দে, যে পয়দা করেছে সে সালা সমঝে নেবে জিন্দা না মুর্দা। ডাক্তার-মানুস্ এটুকু বুঝবে না?

দু-তিনজন ধরাধরি করে একটা অচেতন নারী-দেহ রোয়াকে নামিয়ে দিল। তারপর ওরা ঐ গাড়ি চেপে চলে যায়।

ডক্টর সেন নেমে এসে মেয়েকে ঘরে তুলে নেন। না, মৃতদেহ নয়। অজ্ঞান হয়েছিল জোরালো ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোতে। বেলা দশটা নাগাদ তার ঘুম ভেঙেছে। তার আগেই একজন পরিচিত লেডি ডাক্তারকে দিয়ে ডক্টর সেন কৃষ্ণাকে পরীক্ষা করিয়ে ছিলেন। তার ঘুমন্ত অবস্থাতেই।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল! স্টিচ্ দিতে হয়েছে!

জ্ঞান ফিরে আসার পর কৃষ্ণা কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি।

কিছু খায়নি পর্যন্ত!

তালুকদার নতনেত্রে শুনছিলেন এতক্ষণ। তাপস থামতেই চোখ তুলে তাকান, বলেন, তারপর? ডক্টর সেন পুলিসকে জানিয়েছেন?

—না, স্যার। তবে পুলিস খবর পেয়ে গেছে।

—সারা-দিন সারা-রাত সে অভুক্ত আছে?

—হ্যাঁ, স্যার। শুধু তাই নয়, মৌনও। এখনো পর্যন্ত সে কোন কথা বলেনি।

কোন প্রশ্নের জবাব দেয়নি। ও বোধহয় নির্বাক অনশনে মৃত্যুবরণ করতে চায়!

তালুকদার নীরব রইলেন।

—আপনি স্যার, একবার চেষ্টা করে দেখবেন?

—আমি? আমি কী চেষ্টা করে দেখব? ওর অনশন ভাঙাতে? আমাকে সে [illegible]ভাবে চেনেই না। তার বাবা, ছোট বোন, ভাই যেখানে ওকে রাজি করাতে পারেনি...

—তা বটে।

তালুকদার সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকেন।

তাপসও নীরবতা ভঙ্গ করে না।

যেন অনেক-অনেক দূর থেকে তালুকদার হঠাৎ প্রশ্ন করেন, তাপস! গত বছর আমাদের সোস্যালে কৃষ্ণা কোন্ রবীন্দ্রসঙ্গীতটা গেয়েছিল তোমার মনে আছে?

তাপস জবাব দিল না। বাহুল্যবোধে। এ-কথা কি কারও মনে থাকতে পারে?

তালুকদার বললেন: "দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে, যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে!"



শনিবার রাত সাড়ে আটটায় যথারীতি টেলিফোন করল লোকটা।

প্রশ্ন মাত্র বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে গেল।

টাকাটা হস্তান্তরিত করতে হবে ভবানীপুরে। নর্দার্ন পার্কে। রবিবার দুপুরে কাঁটায়-কাঁটায় বেলা আড়াইটায়। নর্দান পার্কটা কোথায় ? শুনুন বলি : শরৎ বসু রোড ধরে উত্তরমুখো আসছেন দেশপ্রিয় পার্ক থেকে। কেমন তো ? পদ্মপুকুরের পরের স্টপেজ চক্রবেড়িয়া। সেখান থেকে জাস্টিস্ চন্দ্রমাধব রোড ধরে পশ্চিমমুখো চলতে হবে। বাঁ-হাতি গুজরাতীদের মেটার্নিটি হোম পার হলেন। তার পরেই নর্দার্ন পার্ক। তার উত্তর-পূর্ব কোণের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে। পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ধুতি-পাঞ্জাবি পর দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁর পাদমূলে—একটু দূরে—একটি বেঞ্চি পাতা। উপরে ছাউনি। ভর-দুপুরে সেখানে জনমানব থাকবে না। সেখানেই ও প্রতীক্ষা করবে। নেহাৎ ঘটনাচক্রে তখন যদি ওখানে কোনো বেগানা লোক কেউ থাকে তাহলে ও বসে থাকবে আশেপাশের কোনও ফাঁকা বেঞ্চিতে। পরিধানে জীনস্-এর জীর্ণ প্যান্ট, উর্ধ্বাঙ্গে পাকা টোম্যাটো রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে হান্টিং শু, মাথায় ইলাসটিক ব্যান্ডে বাঁধা পীজবোর্ডের হুড—ক্রিকেট-মরশুমে যা ইডেন-গার্ডেন্সে-এ হাজারে হাজারে দেখতে পাওয়া যায়।

এমন বিচিত্র সাজ-পোশাকে ঐ ভর-দুপুরে ঐ পার্কের বেঞ্চিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকার সম্ভাবনা নেই। ভুল হতেই পারে না। তবু সাবধানের মান নেই। ছেলেটি প্রফেসর তালুকদারকে চেনে। ওঁকে দেখতে পেলেই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবে, 'কটা বাজে, স্যার ? আমার হাত-ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

উনি লক্ষ্য করে দেখে নেবেন ওর হাতে শুধু ব্যান্ডই আছে, ঘড়ি নেই। তখন আদান-প্রদান হবে। ছেলেটি ওঁকে প্রথমে দেবে খোলা খামে এক সেট ছবি। সেটা যাচাই করে নিয়ে উনি বার করে দেবেন রসিদ আর স্ট্যাম্প প্যাড। টিপছাপ দেওয়া শেষ হলে উনি ওঁর কাঁধের ঝোলা-ব্যাগটা থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বার করে দেবেন।

সেটা যেন কাগজে ভাল করে জড়ানো ও দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে।

তালুকদার জানতে চান, তুমি বারে বারে, 'ছেলেটি ছেলেটি' বলছ, তার মানে কি বলতে চাও তুমি নিজে আসবে না?

—আজ্ঞে না স্যার। এত বড় মূর্খামি আমি করব না। নিজেই আসব।

—মূর্খামি কেন বলছ?

—ধরুন, আমি রাম-শ্যাম-যদুকে পাঠালাম, আর শালা ফিরে এসে বললে, 'প্যাকেট তো নিয়ে এসেছি গুরু, কিন্তু তাতে একখানা নোটও নেই। শুধুই পুরনো কাগজ ঠাসা!' তখন? কী করে বুঝব, কোন শালা তঞ্চকতা করল, আপনি না আমার চ্যালা?

—তার মানে তুমি টাকাটা গুনে নেবে না?

—কেমন করে নেব, স্যার? ভর-দুপুরে স্বয়ং নেতাজীর পায়ের তলায় বসে ৩৭ানে ব্ল্যাকমেলিঙের নোট আমি গুনতে পারি? গোনা শেষ হতে হতে তো দেখব স্টেনগানধারী পুলিসে নর্দার্ন পার্ক ছেয়ে ফেলেছে।

—আই সী! কিন্তু আমি যদি তোমাকে পঁচিশের বদলে বিশ দিই?

—বিষ যখন দিতে পারছেন না তখন বিশও দিতে পারেন না। নেগেটিভের হাইড্রোজেন বোমা যে আমার হেপাজতেই রয়ে গেল। বুঝেছেন?

অধ্যাপক তালুকদার নীরবে কী যেন ভাবতে থাকেন।

—কী হল? জবাব দিলেন না যে? আপনি লাইনে আছেন তো?

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বললেন, আছি। মন খুলে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, মস্তান। হয়তো তুমি আমার ছেলের বয়সী। তাই কথাটা না বলে থাকতে পারছি না। তুমি আমাকে এই নোংরা কাজটা করতে বাধ্য কর না, মস্তান। এতে তোমার ভাল হবে না!

টেলিফোনে ভেসে এল উদ্ধত যুবকের অট্টহাস্য। বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার নরকযন্ত্রণার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি শুধু নিজের ভালমন্দর কথা চিন্তা করুন। আপনাকে বরং একটা শেষ কথা বলে নিই, স্যার:

পুলিসে খবর দিলে কিন্তু খেল খতম! কলেজে কেমিস্ট্রি লেকচার থিয়েটার ক্লাসের মধ্যেই আপনার লাশ ফেলে দেব। আমার সঙ্গে বেইমানি করে কেউ কখনো পার পায়নি, স্যার। তিনটে ডাকাতি, পাঁচটা রেপ-কেস আর দু-দুটো খুনের মামলা আমার মাথায় ঝুলছে, বুয়েছেন? তার ভিতর একটা আবার পুলিস—এক শালা পুলিস কেদ্দানি দেখাতে গিয়ে আনফরচুনেটলি আমার গুলিতেই ফৌত হয়েছিল। তবু দেখুন, আমি জামিনে ছাড়া! পুলিস আজও কোনও 'আই-উইটনেস্' যোগাড় করতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে? সাক্ষী দিতে রাজি হলেই সে শালা হাফিজ! তাই

পুলিস ডিপার্টমেন্টে আমি-শালা অচ্ছুৎ ! বুয়েছেন ?

বৃদ্ধ অধ্যাপক গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ মস্তান ?

—আজ্ঞে না ! কলেজে আপনার খুব সুনাম শুনি কিনা। সবাই বলে আর. কে. টি. খুব সৎ আর প্রচণ্ড সাহসী। তাঁর নাকি দারুণ বুদ্ধি ! তাই আপনাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছি, এই আর কি। ও-সব থানা-পুলিসের ন্যাকড়াবাজিতে যাবেন না। জানে মারা যাবেন ? আর যদি 'পোলিটিকাল দাদা-টাদা' থাকেন—ঐ যাঁরা হাতে মাথা কেটে থাকেন, তাঁদের কাছেও নয়। জানেনই তো, পাঁচটি বছর হাতে মাথা কাটার পর ওঁরা ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে নামেন—দেশসেবা করবার আর্জি নিয়ে — 'আপনার ভোটটা আমাকে কাইন্ডলি দেবেন, স্যার ?' —সেই দেশসেবকদের টিকি বাঁধা থাকে আমাদের কাছে।

নিঃশব্দে রিসিভারে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

বুঝতে পারেন : ও মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। মৃত্যু ওকে টানছে ! তাই সগর্বে ও ঘোষণা করেছে ওর কীর্তিকাহিনী ! এটাই এখন স্বাধীন ভারতবর্ষের ট্র্যাজেডি।

ইংরেজের অপশাসনের হাত থেকে দেশটাকে স্বাধীন করতে যাঁরা প্রাণপাত করেছিলেন, কালের ধর্মে তাঁরা ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছেন ইতিহাসের নেপথ্যে। এখন এগিয়ে আসছে আর এক জাতের অপশাসক। স্বার্থান্ধ, স্বজনপোষক, মিথ্যাচারী ! দেশশাসনের নামে দেশশোষণ করতে তারা হিট্‌লারী পদ্ধতিতে পোষে নিজ নিজ দলের গেস্টাপো বাহিনী : গুণ্ডা, মস্তান, মাসল্‌ম্যান, প্রফেশনাল খুনী ! পলিটিকস্‌ আজকের দিনে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াতে ইচ্ছে করে এমন দেশসেবক আজও ক্বচিৎ দেখা যায়—তাঁরা অব্যতিক্রম দেশের নির্বাচনে প্রার্থী হন না। হয় গান্ধীবাদী, নয় সুভাষবাদী অথবা অগ্নিযুগের শেষ অবশেষ। তাঁরা ক্লান্ত ! তাঁরা বিভ্রান্ত ! তাঁরা খবরের কাগজও পড়েন না। ভোট দিতেও যান না। কাকে দেবেন ?

দেশের ভালমন্দ নির্ধারণ করেন, দেশশাসন তথা দেশশোষণ করেন, আপনার-আমার নির্বাচিত প্রতিনিধির দল।

পাছে আমরা নির্বাচনে ভুল করে বসি, তাই দেশসেবক জনপ্রতিনিধিরা নানান ব্যবস্থা করে রেখেছেন—শাসকদলের মতাদর্শের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে ওঁরা সে কণ্ঠকে নীরব করিয়ে দেন। লেলিয়ে দেন পোষা গুণ্ডা। গৌরবে তাদের বলা হয় — পার্টি ক্যাডার।

দিল্লী শহরের পথে-ঘাটে নাটক করে বেড়াতো একটি প্রাণবন্ত তরুণ। সস্ত্রীক। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তার। জন্মসূত্রে মুসলমান। মুশকিল এই : আহাম্মকটা সাম্যবাদী। বোঝ বখেড়া। কী দরকার তোর এই চূড়ান্ত অ-সাম্যের দেশে সাম্যবাদ

নিয়ে আমড়াগাছি করার? মিলমালিক কী-কায়দায় মজদুরকে শোষণ করে, বড় জোতদার কীভাবে বর্গাদারকে ভূমিহীন মজুর চাষীতে রূপান্তরিত করে, ডাইনাস্টিক্-রুলে দেশশাসক কীভাবে দেশশোষক হয়ে যায়, তা নেচে-কুঁদে দেখালে কি তোর চারটে হাত গজাবে? পার্টি-মস্তান গোপনে হুমকি দিলেন : 'বন্ধ্ কর য়্যে নটুঙ্গী-খেল্'! মূর্খটা শুনলো না। পড়িলিখি ইনসান! 'Right to Perform' নামে একখানা কিতাব লিখেছে অংরেজিতে—পড়ে দেখ—কী দারুণ বিদ্যে! পোষ মানলে বকরি-নোকরি-ছুকরি সবই পার্টি থেকে দেওয়া হতো। লেকিন, শুনল না। অগত্যা! একদিন পথ-নাটকের মাঝখানে ট্রাকে চেপে হামলা করল গেস্টাপো বাহিনী। ঝাঁপিয়ে পড়ল নাটকের কুশীলবদের উপর। ওর ঔরৎটা জানে বেঁচে গেল, ও জান বাঁচাতে সেক্‌লো না! ক্যা আপসোস্ কি বাত! শত শত দর্শকের সামনে লুটিয়ে পড়ল নাট্যকার! কলিজার খুনে ভেসে গেল দিল্লীর রাজপথ!

আদালতে মামলা উঠল! পার্টি-পেপার ব্যতীত সমগ্র ভারতের সংবাদপত্র এই নৃশংস বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানালো। মায়, সারা-ভারত টি. ভি. স্ক্রীনে দেখল চলচ্চিত্র উৎসবে শাবানা আজমি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল—শাসকদলের বেইজ্জতির চূড়ান্ত। এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্টেটমেন্ট দিলেন, 'হামে কদম উঠানা চাহিয়ে কি য়্যে গুণ্ডোলোগোঁ কি বদমাসি বন্ধ্ কিয়া যায়...'

'কদম' কতটা উঠেছিল প্রফেসর তালুকদার জানেন না, তবে 'কর্দম' উঠেছিল অনেকটাই। আদালতে যখন মামলা উঠল তখন সহস্র দর্শকের ভিতর একটিও প্রতক্ষ্যদর্শীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রায় সমান্তরাল ঘটনা ঘটে গেল ওঁর নিজের শহরে—এই তো সেদিন। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পদস্থ মধ্যবয়সী মহিলা অফিসারকে রেড-ক্রস-ছাপমারা গাড়ি থেকে টেনে নামানো হল। একহাট লোকের সামনে মস্তান-পার্টি ঐ মহিলাকে বিবস্ত্র ও হত্যা করল। এ ভদ্রমহিলা কিন্তু দিল্লীর সেই তরুণ নটুয়ার মতো কোনো একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করতে রাস্তায় নামেননি। সমাজকল্যাণ দপ্তরের তিনি এক সম্মানীয় অফিসার। সরকারী কাজে ট্যুরে বেরিয়েছিলেন। রাজনীতির ধারে-কাছে নেই। তবে হ্যাঁ, দুর্জনে বলে, তিনি নাকি একটি তদন্তও করছিলেন : এক আন্তর্জাতিক সংস্থার বিনামূল্যে প্রেরিত ঔষধপত্র কীভাবে চোরাবাজারে বিক্রয় হচ্ছে সে বিষয়ে তদন্ত!

এবারেও হাটের কেন্দ্রবিন্দুতে অনুষ্ঠিত ঐ নাটকের—দুঃশাসনকর্তৃক দ্রৌপদীবস্ত্রহরণ পালার—কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই! হত্যার সময়ে হাজার হাটুরে যে চোখ খুলে ছিল এমন প্রমাণ নেই, তবে কমিশনের সামনে কেউ যে মুখ খুলবার সাহস পায়নি

তার প্রমাণ আছে।

আমরা শুনলাম—আদালতে নয়, বাইরে : 'এমন তো হয়েই থাকে !'

ফলে, ঐ অজ্ঞাত-পরিচয় মস্তান যা দাবী করেছে, তা মিথ্যা আস্ফালন নয়। সত্যই জনপ্রতিনিধিদের ছত্রছায়ার আড়ালে ও যথেচ্ছাচার করে যাচ্ছে। 'যুগ-যুগ-জিও' আইনে করে যাবেও। ছেলেটা কথাপ্রসঙ্গে ওঁকে 'আর. কে. টি.' নামে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ ছাত্রমহলে ওর যাতায়াত আছে।

এ কথা নিশ্চিত : ও যদি 'কেমিক্যাল ল্যাব'-এর ভিতর অথবা লেকচার থিয়েটারে ঢুকে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ওঁকে গুলি করে মেরে ফেলে, তারপর শিস দিতে দিতে কলেজ থেকে বেরিয়ে যায়, মোটর বাইকে চেপে হাওয়া হয়ে যায়—তাহলে, পরে পুলিস রোল-কলের খাতা মিলিয়ে একচল্লিশটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একটিও প্রত্যক্ষদর্শী উদ্ধার করতে পারবে না।

এই আজকের সমাজ-ব্যবস্থা !

আর্দশের জন্য মরতে উনি ভয় পান না ! কিন্তু প্রণতি ! তার কী হবে ? যদি এ অসম যুদ্ধে সাহসিকতা দেখাতে গিয়ে...

নাঃ। উপায় নেই ! ছোকরার প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া !

পঁচিশ হাজার টাকার জন্য দুঃখ করছেন না। ওঁর কোনো ওয়ারিশ নেই। প্রণতির আজীবন ভরণ-পোষণ-সেবাযত্নের জন্য টাকা জমা দেওয়া আছে ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে—যদি দৈবাৎ ওঁর ডাক আগে এসে যায়। বাকি অর্থের কিছুটা পাবে তোতন। বাকিটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। পঁচিশ হাজার টাকার অঙ্কটা সেদিক থেকে কিছুই নয়।

বেদনা দু-তরফা।

এক : ঐ নরকের কীটের কাছে হার মানা। এদিকে মাস্তান ওঁকে দোহন করছে। আর ওদিকে লালমোহন কৃষ্ণার বডি নামিয়ে দিচ্ছে তার বাপের দাওয়ায় ! উনি প্রতিবাদ করতে পারছেন না।

দুই : নিজের ভ্রান্তি ! উনি সঠিক কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করতে পারলেন না ! ক্যালসিয়াম, সিলিকা আর সোডা অ্যাশ-এর মিশ্রণকে আইডেন্টিফাই করলেন 'ক্রিস্ট্যালাইজড রেগুলার অক্টাহেড্রনাস স্ফটিক' বলে। সোজা কথায় বেলোয়ারী-কাচকে হীরকখণ্ড বলে ভুল করলেন আজন্ম অদ্বিতীয় কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ! ভুলটা হল কখন ? ঠিক কোথায় ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে ! ও যখন বললে, 'তোমাকে তোমারি অস্ত্রে বধ করব এবার ! বলতো, অধ্যাপক, বুদ্ধযুগে, একজন অযোনিসম্ভবা জনপদকল্যাণী সে-কালীন শ্রেষ্ঠ ভেষগাচার্যকে গর্ভে ধারণ করে...'

তখনি, ঠিক তখনি, ওঁর সব ভুল হয়ে গেল। উনি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেলেছিলেন

অর্ধ-অনাবৃতার বাহুমূল ! না, না, কামপরবশ হয়ে নয়, তবে হ্যাঁ, উত্তেজনায়.! ওঁর মনে পড়ে গেছিল মাতা আম্রপালীর কথা !

হ্যাঁ ! রূপোপজীবিনী রাজনটী আম্রপালী নয়, বৌদ্ধ ভিক্ষুণী : 'মাতা' আম্রপালী !

আম্রপালী ! তাঁর জন্ম নিয়ে নানান কিংবদন্তী। বিনয় পিটক অনুসারে তিনি স্বয়ম্ভু, অযোনিসম্ভবা ! বৈশালী নগরী তখন লিচ্ছবীদের রাজধানী। সেই নগরীপ্রান্তে এক আম্রকাননে পূর্ণযৌবনারূপে আম্রপালীর আবির্ভাব। সকলকলাপারঙ্গমা এই উর্বশীবিনিন্দিতাকে মহিষী করার জন্য একযোগে লিচ্ছবীরাজের কাছে আবেদন করলেন প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ। সকলেই মহাক্ষত্রপ ঃ ক্রৌঞ্চ, শাক্য, মগধ, পাঞ্চাল। অযুত পাণিপ্রার্থীর ভিতর মাত্র একজনকেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব—মগধ ব্যতিরেকে, কারণ মগধরাজ বিম্বিসার লিচ্ছবিদের শত্রু—কিন্তু বাদবাকি সবাই যে তাহলে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে ! লিচ্ছবি মহারাজ তখন 'গণ'-এর শরণ নিলেন। গণ হচ্ছে 'সিটি কাউন্সেল'—নগর প্রধানদের পঞ্চায়েত।

গণ নির্দেশ দিলেন : আম্রপালী হবে জনপদকল্যাণী, শত্রু ভিন্ন সর্বজনভোগ্যা !

আম্রপালী হল স্বৈরিণী, রাজনটী।

নগরীর রাজপুরুষ, শ্রেষ্ঠী তো বটেই—বিদেশী ক্রৌঞ্চ, শাক্য, পাঞ্চালের সওদাগরেরাও অর্থমূল্যে এই নাগরীর শয্যাসঙ্গী হবার সৌভাগ্যলাভ করল। এমনকি লিচ্ছবি প্রহরীদের চোখে ধূলো দিয়ে ছদ্মবেশে স্বয়ং মগধরাজ বিম্বিসারও গঙ্গা পার হয়ে রাত্রিবাস করে যেতেন ঐ পণ্যাঙ্গনার প্রমোদভবনে।

ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা—ঐ শত্রুরাজ বিম্বিসারের ঔরসেই গর্ভবতী হল আম্রপালী !

পুত্রের নাম জীবক। কিন্তু লিচ্ছবীরাজের আদেশে তার চূড়াকরণ হল না, বিদ্যারম্ভ হল না। মাতার কাছে সর্ববিদ্যা অধ্যয়ন করতে থাকে জীবক, পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ ভেষগাচার্য !

আমাদের কাহিনীর কালে আর্যাবতের শ্রেষ্ঠ মানুষ শাক্যসিংহ। তিনি তখন পরিব্রাজক। কিন্তু রাজচক্রবর্তী মগধাধিপতি বিম্বিসার। জাহ্নবীর দক্ষিণপাড়ে পাটলীপুত্র, উত্তরে বৈশালী।

দিন যায় ! আম্রপালী এখন তার বিশাল প্রমোদভবনে অন্তরীণ। কেউ তার সন্দর্শনে যেতে পারে না। রাজাদেশে। কারণ আম্রপালী শত্রুপুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। তাই স্বগৃহে অন্তরীণ।

তারপর একদিন।

বৈশালীতে এলো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ভগবান বুদ্ধ চলেছেন কুশীনগর : বৈশালীর

উপর দিয়ে। এক রাত্রি তিনি বাস করে যাবেন মহানগরীতে। মহাপরিব্রাজক তখন অতি বৃদ্ধ, সঙ্গে আছেন মহা মৌদ্‌গল্ল্যায়ন, সারিপুও এবং আনন্দ। লিচ্ছবিরাজ ধন্য হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করা হল এই আশায় যে, শাক্যসিংহ সপার্ষদ সেখানেই রাত্রিবাস করবেন।

নগরপ্রান্তে আম্রকাননে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছেন সপার্ষদ তথাগত। সমস্ত নগরীর নরনারী সে-সন্ধ্যায় সমবেত হয়েছে ঐ আম্রকাননে, পরমকারুণিকের দর্শনে। এমনকি — কী দুঃসাহস—সেই জনারণ্যে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে উপস্থিত হয়েছে ঐ পাপিষ্ঠা ! কী অপরিসীম দুঃসাহস ! কানীন পুত্রটিকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

দীর্ঘসময় অতিবাহিত হলে লোকুত্তমের ধ্যানভঙ্গ হল। জনতার প্রথম সারি থেকে একযোগে দণ্ডায়মান হলেন লিচ্ছবীরাজ মহানাম, নগরশ্রেষ্ঠী এবং গণপ্রধান। সকলেই চাইছেন সপার্ষদ বুদ্ধদেবকে আমন্ত্রণ করতে। কিন্তু তাঁরা কিছু নিবেদন করার পূর্বেই জনতার লক্ষ্য হল—মহাকারুণিকের করুণাঘন দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে জনারণ্যের শেষপ্রান্তে এক অন্তেবাসিনীর উপর।

শাক্যসিংহ সহাস্যে বললেন, আম্রপালিকে ! বৈশালী নগরীতে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত করতে চাই। তোমার সর্বতোভদ্রে আমাদের ভিক্ষু কয়জনের ঠাঁই হবে ?

পরিবর্তে সভাস্থলে বজ্রপাত হলেও জনতা এমন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হত না।

'সর্বতোভদ্র' ! সর্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রাসন ! ঘৃণিত দেহোপজীবিনীর গণিকালয় !

আম্রপালী উঠে দাঁড়াল। কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে এল। কী যেন বলতে গেল। পারল না। ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল তার। নতজানু হয়ে বসে পড়ল মহামানবের পদপ্রান্তে।

মহাভিক্ষু সারিপুত্ত বললেন, জীবকমাতা ! ভগবান বুদ্ধ তোমার আতিথ্য ভিক্ষা করেছেন। তুমি তাঁকে আমন্ত্রণ করবে না ?

না ! পারবে না ! কিছুতেই পারবে না ! সেই পতিতালয়ে গণিকা আম্রপালী কেমন করে আহ্বান জানাবে 'লোকুত্তম'কে ? হতভাগিনী তার অনিন্দ্য-আননটি নীরবে নামিয়ে আনে সহস্রদল পদ্মের মতো যুগলচরণে—আযৌবনের অযুত পরুষ-পুরুষ-স্পর্শের পুরীষ অশ্রুর বন্যায় ধৌত হয়ে গেল।

লিচ্ছবীরাজ ও গণ-এর পরাজয় ঘটল।

সেই ঘৃণিতা দুর্বিনীতা রাজনটী — যে আশ্রয় দিয়েছিল লিচ্ছবীদের চিরশত্রুকে আপন শয়নকক্ষে, যে সেই মহাপাষণ্ডের বীর্যকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করে পাপের পশরা পূর্ণ করেছে—সেই কলঙ্কিনীর হল জয় !

ভগবান বুদ্ধ সশিষ্য অতিথি হলেন নটীর প্রমোদভবনে।

পিটককার বলেননি — আহা, কেন বলেননি— সেই অবাক-রাত্রিতে মহাকারুণিক কী উপদেশ দিয়েছিলেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে — ঐ হতভাগিনী কানীনপুত্রের জননীকে! বস্তুত আদৌ কোন উপদেশ যে তিনি দিয়েছিলেন তারও উল্লেখ নেই, ইঙ্গিত নেই। বোধকরি সেরাত্রে আম্রপালীর অন্তরে মুক্তির জন্য এমন একটি ঐকান্তিক আকুতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যার জন্য মৌখিক উপদেশ ছিল বাহুল্য!





রবিবার ছুটির দিন। তবু সকাল সকাল দুটি খেয়ে নিয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ বাড়ি থেকে বার হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হাতে ছাতা, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। তার ভিতর স্টীলের সেই ক্যাশবাক্স ছাড়াও ছিল একটা স্ট্যাম্প-প্যাড আর এক খণ্ড কাগজে সেই স্বীকৃতি "পত্রবাহকের নিকট ব্ল্যাকমেলিং বাবদ প্রথম ও শেষ কিস্তি হিসাবে পঁচিশ হাজার টাকা দশ ও বিশ টাকার নোটে বুঝিয়া পাইলাম।" গোটা-গোটা হরফে রসিদটা লিখতে লিখতে প্রফেসর তালুকদারের মনে হয়েছিল, তিনি বোধহয় ব্ল্যাকমেলিঙের ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করে গেলেন : রসিদ নিয়ে ব্ল্যাকমেলিঙের প্রথম ও শেষ কিস্তি মেটানো। নিজের গাড়ি গ্যারেজ থেকে বার করলেন না। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে, মায় জুতোর ফিতেটা বেঁধে রামুকে বললেন, একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে—ভবানীপুরের পদ্মপুকুরে যাবেন।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল দরজায়। ডানে-বাঁয়ে দেখে নিয়ে সাবধানী প্রৌঢ় মানুষটি ছাতা বগলে, ব্যাগ কাঁধে ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন।

দুপুরের ফাঁকা রাস্তা। গোলপার্ক, সাদার্ন অ্যাভিন্যু, শরৎ বসু রোড ধরে চক্রবেড়িয়ার মোড়ে পৌঁছাতে সময় লাগল বাইশ মিনিট। শরৎ বসু আর চক্রবেড়িয়ার মোড়ে, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিপরীতে ট্যাক্সিটাকে থামালেন। তখন দুটো দশ। এখনো কুড়ি মিনিট সময় হাতে আছে। যথেষ্ট সময়। এটুকু পথ উনি হেঁটেই যেতে চান। ট্যাক্সি-ড্রাইভারটাকেই বা বেহুদ্দো সাক্ষী রাখেন কেন? ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ছাতাটা খুলে উনি গুটি গুটি জাস্টিস্ চন্দ্রমাধব রোড ধরে পশ্চিমমুখো চলতে থাকেন। কাঁধে ব্যাগ।

পথ এই মধ্যদিনে প্রায় নির্জন। দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে হুস্-হাস করে। রিকশার ঠুন-ঠুন। বাঁ-দিকে গুজরাতিদের একটা মেটার্নিটি হোম। তার পাশেই এক ভাজিওয়ালার দোকান। বিপরীত ফুটপাতে 'দক্ষিণাকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। ঘড়িটা দেখলেন আবার : দুটো কুড়ি। এখনো দশ মিনিট বাকি।

হঠাৎ স্থির করলেন নির্ধারিত সময়ের আগেই উনি ঐ বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকবেন। ছাতা মাথায়। দেখবেন জীনস্-এর প্যান্ট পরা, টম্যাটো-রঙের স্পোর্টস্ গেঞ্জি গায়ে লোকটা কোন দিক দিয়ে পার্কে ঢোকে। লক্ষ্য করে দেখবেন সে একা আসে কি না। কী চেপে এল। প্রাইভেট কার হলে তার নম্বরটা ওঁকে দেখে নিতে হবে। ট্যাক্সি হলেও তাই। আর যদি হাঁটতে হাঁটতে আসে তবে ওর হাঁটার ধরনটা অনেকক্ষণ ধরে দেখবার সুযোগ পাবেন। ভবিষ্যতে আইডেন্টিটি প্যারেডে....

রাস্তাটা পার হয়ে পার্কের ভিতর যাবেন, বাঁ দিক থেকে একজন মোটর-বাইক-চালিয়ে প্রায় ওঁর ঘাড়ের উপর এসে ব্রেক কষে। ব্যাগ সামলে উনি দু-পা পিছিয়ে যান। লোকটা বললে, সরি !

উনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মোটর-সাইকেলের আরোহীর গায়ে হালকা নীল রঙের একটা উইন্ড-চিটার, মাথায় হেলমেট, চোখে গগল্স্। তার বাঁ-হাতে একটা চিরকুট। ডানে-বাঁয়ে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করে, উত্তর দিক কোনটা, স্যার ?

তালুকদার-সাহেব ওর থেকে প্রায় দু-মিটার দূরে সরে এসেছেন। তবু সেখান থেকেই মনে হল ওর হাতে ওটা একটা স্কেচ-ম্যাপ। প্রফেসর তালুকদারের কাছে কম্পাস নেই, কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ নিশানাটা তাঁর গুলিয়ে যায়নি। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

লোকটা বললে, তার মানে এইটা যদুবাবুর বাজার ?

এবার সে তার ম্যাপের উপর তর্জনিটা রেখেছে।

কাগজটা দেখতে অধ্যাপক তালুকদার ঘনিয়ে এলেন ওর কাছে। লোকটা তার হাতে-ধরা ম্যাপের দিকে তাকিয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল ওঁর দিকে। সেটা মৃদুভাবে স্পর্শ করল ওঁর তলপেট। সেদিকে তাকিয়ে বজ্রাহত হয়ে গেলেন তালুকদার-সাহেব।

ওর মুঠিতে ধরা আছে একটা রিভলভার। খেলনার নয়, খাঁটি মাল !

উনি কী একটা কথা বলতে গেলেন। কথাটা শোনা গেল না। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই লোকটা কিক্ করে মোটর-সাইকেলে আবার স্টার্ট দিল। প্রচণ্ড শব্দে তালুকদারের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে, মোটর-বাইকের শব্দকে ছাপিয়ে, গগল্স্-পরা লোকটা বললে, প্রফেসর তালুকদার ! কোনও উচ্চবাচ্য করবেন না। আপনার কাঁধের ঝোলাটা- আমার কেরিয়ার ব্যাগে ভরে দিন। কুইক !

তালুকদার তখন থরথর করে কাঁপছেন। ত্রিসীমানায় একটা লোক নেই। ওদিকে খানকয় গাড়ি পার্ক করা আছে বটে, কিন্তু যাত্রীবিহীন। দক্ষিণাকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে একজন প্রৌঢ়া মহিলা খরিদ্দারকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে।

ভট্ ভট্ ভট্ বিকট শব্দের মধ্যেই লোকটা বললে, প্রফেসর ! আপনি নিজে হাতে

ভরে না দিলে আপনার কিডনিটা ফুটো করে ব্যাগটা ছিনিয়ে নেব কিন্তু। আমি তিন গুনব....এক...দুই...

উনি কাঁধ থেকে ব্যাগটা খুলে নিয়ে কিছু বলতে গেলেন। এবারও তাঁকে থামিয়ে দিয়ে লোকটা ব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। রেখে দিল ওর কেরিয়ার-ব্যাগে। তারপর একগাল হেসে বলল, আপনি পণ্ডিত মানুষ, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, আমি 'মাস্তান' নই। আমার নাম 'নেপো'! মাস্তান—ঐ দেখুন—ঐ পার্কে ঢুকছে। বুড়ো আঙুল চুষতে। আঙুল তুলে সে পার্কের বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করল।

একটি গাঁট্টাগোট্টা লোক গেট দিয়ে পার্কে ঢুকছিল। তার পরনে জীন্স্-এর প্যান্ট, গায়ে টম্যাটো রঙের গেঞ্জি। মাথায় হুড। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হেলমেট-পরা মোটর সাইকেলে-বসা একজন লোক আঙুল তুলে তাকে দেখাচ্ছে! তার হাতে রিভলভার!

লোকটা চোঁ-চাঁ দৌড় মারল এক দিকে।

মুহূর্ত-মধ্যে ফুলস্পীডে নেপো বেরিয়ে গেল উল্টো দিকে।

বজ্রাহত হয়ে মাঝ-সড়কে উনি ছাতা মাথায় দাঁড়িয়েই থাকলেন।

বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল মোটর-বাইক। টম্যাটো-কালার স্পোর্টস্ গেঞ্জি তার অনেক আগেই হাওয়া।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তালুকদার সাহেবের। ভুল হয়ে গেল। সামান্যর জন্য।

দক্ষিণাকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি দইয়ের ভাঁড় হাতে এতক্ষণে ও-দিকের ফুটপাতে ধরে বাড়িপানে হাঁটা ধরেছেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা। তালুকদারকে দেখে। মাঝ-সড়কে ও বুড়োটা অমন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন ছাতা মাথায়? পাগল নাকি?

সোম-মঙ্গল দুটো দিন প্রচণ্ড টেনশনে কাটল। কলেজে গেছেন; কিন্তু যাবার আগে টেলিফোনটা রিসিভার থেকে নামিয়ে রেখে ঘর তালাবন্ধ করেছেন। উনি চাননি ওঁর অবর্তমানে মাস্তান বাড়িতে ফোন করে। সোম-মঙ্গল দুটো দিনই সন্ধ্যার পর দ্বার রুদ্ধ করে অপেক্ষা করেছেন টেলিফোনের উপর বাঁ-হাতটা রেখে—রাত সাড়ে আটটায়। মাস্তান ফোন করেনি। পঁচিশ হাজার টাকার দাবী পুনরায় পেশ করে হুমকি দেয়নি।

কিন্তু—কেন? কেন? কেন?

ব্যাগটা যে ছিনতাই হয়ে যাবে এটা জানতেন। নিশ্চিতভাবে। সেটা ছিনতাই হবেই। আন্দাজে নয়, স্বাভাবিক যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত। মাস্তান টিপছাপসহ রসিদ দিয়ে যখন ব্ল্যাকমেলিঙের টাকাটা নিতে স্বীকৃত হল সেই মুহূর্তেই উনি সেটা বুঝে নিয়েছিলেন।

অমন একটা রসিদ সে প্রফেসর তালুকদারের ব্যাঙ্ক ভল্টে রাখতে রাজি হবে না। কিছুতেই না। ঐ যুক্তিটা ধোপে টেকে না—ঐ দু-পক্ষের আর্সেনেলে হাইড্রোজেন বম্ব্ থাকা। তালুকদার ষাটের কোঠায়, মাস্তান বোধকরি বিশ-বাইশ। মাস্তানের প্রত্যাশিত মধ্যবয়সে তালুকদার সাহেবের ওয়ারিশ ব্যাঙ্ক ভল্ট খুলবে। তখন ? হয়তো উনি সমস্ত ঘটনাটা একটা 'এফ আই. আর.'-এর মতো লিখে তার সঙ্গে ঐ রসিদ পিন দিয়ে গেঁথে তাঁর ব্যাঙ্কভল্টে রেখে গিয়েছেন। প্রতিশোধ নিতে। তাহলে ?

প্রফেসর তালুকদার তাই আন্দাজ করেছিলেন, নর্দার্ন পার্কে পৌছবার পূর্বেই তাঁর ব্যাগটা ছিন্তাই হয়ে যাবে। সেজন্য সাবধানী মানুষটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিয়েছিলেন ঠিকই। সেজন্যই সেদিন চাঁদ্‌নির বাজারে ওঁকে একজোড়া টর্চের ব্যাটারি কিনতে হয়েছে, ইঁদুরমারা স্প্রিংকল, সোলডারিং তার কিনতে হয়েছে। সেজন্যই দু-দুটো দিন নির্জনকক্ষে সাধনা করতে হয়েছে।

কিন্তু ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মাস্তান নিজেই আসবে টাকাটা ছিনিয়ে নিতে। তাই মোটর-সাইকেল আরোহীর অতর্কিত আবির্ভাবটা অপ্রত্যাশিত ছিল না ওঁর কাছে ; কিন্তু দাবাবোড়ে-ছকের ও-প্রান্তে ঘোড়ার চালে ওঠশাই কিস্তিটা ওঁর নজরে পড়েনি। উনি ভাবতেই পারেননি, মাস্তান, এভাবে দাবা-ধরে ঘোড়ার-চালে কিস্তি দিতে পারে।

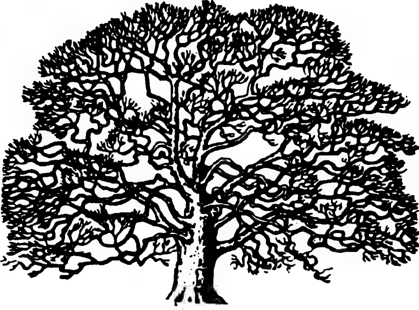
তাই বেমক্কা 'নেপো'র সহকারীর আবির্ভাবে উনি হতচকিত হয়ে পড়েন। মাস্তানকে ডিঙিয়ে দধিভক্ষণমানসে দ্বিতীয় একটি নেপোর আবির্ভাবটা ছিল হিসাবের বাইরে। দুজন যে দুদিকে পালালো ! উনি কী করবেন ?

কিন্তু সোম-মঙ্গল দু-দুটো দিনের মধ্যে মাস্তান টেলিফোন করল না। নতুন করে পঁচিশ হাজার টাকার দাবীটা পেশ করল না।

কেন ? কেন ? কেন ?

হয় মস্তান, নয় নেপো, একজন না একজন তো তাঁকে ফোন করবেই। দুজনের মধ্যে যে ফাঁকে পড়েছে !





গ্যারেজে গাড়িটা তুলে দিয়ে সবে তালা লাগিয়েছেন, বাড়ির দিকে এক পা বাড়াবেন, তখনই ওঁর পাঁজর ঘেঁষে এসে থামল একটা মোটর সাইকেল। না দেখেই ওঁর মনে হল : নেপো। দইয়ের হাঁড়িটা 'মধুসূদন-দাদার' ভাঁড়ের মতো বারে বারে ভরে ওঠে কি না দেখতে এসেছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, না, নেপো নয়। কালো কোট গায়ে একজন অপরিচিত যুবক। নেপোকে উনি চেনেন না। তার চোখে ছিল গগল্‌স্, মাথায় হেলমেট—এরও তাই ; কিন্তু দেহদৈর্ঘ্যে এ সেই নেপোর চেয়ে অন্তত ছয় ইঞ্চি লম্বা। ও —আজকাল তো আবার ছয় ইঞ্চি বলা চলবে না—পনের সে. মি. আর কি !

—প্রফেসর তালুকদার ?

—ইয়েস ?

—প্রফেসর রঞ্জন তালুকদার, পি. আর. এস. ?

—হ্যাঁ তাই। আপনি কে ?

মোটর-বাইকটা একপাশে সরিয়ে এগিয়ে এল। সসম্ভ্রম নমস্কার করে এবার নিম্নকণ্ঠে বললে, ডিটেকটিভ-সার্জেন্ট প্রণব মজুমদার, স্যার। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

ভিতরের পকেট থেকে ওর আইডেন্টিটি কার্ডটা বার করে দেখায়।

সাবধানী মানুষটি আলোর নিচে ভাল করে দেখে নিলেন। হ্যাঁ, লোকটা পুলিস-বিভাগের অফিসার, এতে সন্দেহ নেই।

—আসুন ভিতরে আসুন।

—আপনি আমাকে তুমিই বলবেন, স্যার, কিন্তু ঐ পার্কের দিকে গেলে ভাল হতো না ? আমি কিছু.... মানে... গোপন কথা জানতে চাইব... হয়তো কিছুটা সঙ্কোচের...

তালুকদার হেসে বললেন, আমি পেশায় মাস্টার মানুষ। বয়সেও তোমার ডবল, আমার কাছে আবার তোমার সঙ্কোচ কিসের, মজুমদার ?

প্রণব কেশে গলাটা সাফা করে নিল। তারপর বলল ইয়ে... মানে, সঙ্কোচটা

আমার তরফে নয়, স্যার...... মানে, আপনার তরফে.... মিসেস্ তালুকদার কি বাড়িতেই আছেন ?

—আছেন। তুমি জান না, তাই প্রশ্ন করছ। মিসেস্ তালুকদার আজ আঠাশ বছর শয্যাশায়ী, পার্মানেন্টলি ইন্‌ভ্যালিড !

প্রণব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর বললে, আয়াম সরি। আমি জানতাম না স্যার, কিন্তু আপনার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিরা কেউ কি এখন বাড়িতে....

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তালুকদার ম্লান হেসে বলেন, বিবাহের এক বছরের মধ্যেই আমার স্ত্রী পঙ্গু হয়ে যান, প্রণব, সংসারে আর কেউ নেই। এস, ভিতরে এসে বস।

গাড়ি পার্কিং-এর শব্দ পেয়েই রামু এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। উনি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট প্রণব মজুমদারকে নিয়ে এসে ওঁর স্টাডিতে বসালেন। তার মুখোমুখি বসতে যাবেন তার পূর্বেই রামু ঘোষণা করে, মাইজী বোলাতি হৈঁ !

অগত্যা ফ্যানটা খুলে দিয়ে স্ত্রীর ঘরে চলে আসেন।

শয্যাশায়ী মানুষটির কৌতূহল অফুরন্ত। আর সে কৌতূহল মেটানোর তর সয় না। প্রণতি জিজ্ঞেস করেন, মোটর-সাইকেল চেপে কে এল গো ?

—ডিটেকটিভ পুলিস-সার্জেন্ট। রামুকে বল, দু'জনের চা-জলখাবার দিয়ে যেতে। আমরা দরজা বন্ধ করে কথা বলব। ও যেন টোকা দেয়।

এ কথাগুলো উনি নিজেই রামুকে বলতে পারেন। সচরাচর বলেন না। প্রণতিকে দিয়ে বলান। অর্থাৎ শুয়ে-শুয়ে যতটা গৃহিণীপনা করা চলে আর কি।

প্রণতি জানতে চান, ডিটেক্‌টিভ পুলিস-সার্জেন্ট ! ও কেন এসেছে ?

—বাঃ ! ভুলে গেলে ? সেই অসভ্য মাস্তানটা আমাকে টেলিফোনে শাসিয়েছিল, মনে নেই ? সেই তার বোন—কী যেন নাম—তাকে পাস করিয়ে দিতে—

প্রণতি বলেন, মালিনী।

—হ্যাঁ, মালিনী। তাই ও এসেছে আমার নিরাপত্তা বিধানে !

—ও আচ্ছা। যাও, আমি রামুকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এবার বাইরের ঘরে ফিরে এসে ওর মুখোমুখি বসে বললেন, এবার বল মজুমদার, আমার সঙ্কোচ হবার মতো কী কথা বলতে চাও ?

—আপনি কি, স্যার, 'মেঘচুম্বিত' অ্যাপার্টমেন্টটা চেনেন ?

তালুকদারের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সংক্ষেপে বলেন, চিনি।

—মাসখানেকের ভেতর ওখানে গেছেন ?

একটু ইতস্তত করে স্বীকার করলেন, গেছি।

—আট তলার বিশ নম্বর ফ্ল্যাটে ? মিস্টার সোন্ধীর অ্যাপার্টমেন্টে ?

এবার সরাসরি জবাব দিলেন না। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, মজুমদার, ভারতীয় সংবিধানে প্রভিসন্স আছে, পুলিস যদি মনে করে....

—আজ্ঞে, না না, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন ! আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি মাত্র। আপনাকে অভিযুক্ত করার ইচ্ছা আমাদের আদৌ নেই। আচ্ছা .... আমি বরং ব্যাক-গ্রাউন্ডটা আপনাকে খুলে বলি। তাহলে আপনার পক্ষে আমাদের সহযোগিতা করা সহজতর হবে। শুনুন.... গতকাল রাত্রে ট্যাংরার একটা বস্তির ঘরে সার্চ করতে গিয়ে আমার সহযোগী পুলিস একটা চাবি-দেওয়া অ্যাটাচি-কেস পায়। সেটা খুলে দেখা যায় তার ভিতর গোনা-গুনতি বাইশটা ম্যানিলা-কাগজের খাম। প্রতিটি খামের উপর এক-একজনের নাম লেখা। নাম আর ঠিকানা, কী কাজ করেন, কর্মস্থলের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর। নামগুলি, অব্যতিক্রম, পুরুষের। আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি, অধিকাংশই বয়স্ক, অর্থবান এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের। প্রতিটি খামের ভিতর চার-ছয়টি রঙিন হট্-শট ফটোগ্রাফ —পোস্টকার্ড সাইজ—এবং সেলোফোনে মোড়া ঐ ছয়টি আলোকচিত্রের নেগেটিভ।

মজুমদার এই পর্যন্ত বলে থামল।

অধ্যাপক তালুকদার অধোবদনে নির্বাক বসে রইলেন।

আবার শুরু করল প্রণব, ছবিগুলি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র নরনারীর। ইন ফ্যাক্ট, সঙ্গমরত নরনারীর। বাইশটি খামে একই রমণী—কিন্তু পুরুষগুলি বিভিন্ন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, খামের উপর যাঁর নাম-ঠিকানা লেখা আছে তাঁরই ছবি। ....ওর একটা খাম, তাতে ছয়টা ফটো আর ছয়টা নেগেটিভ ছিল....

নিতান্ত সৌভাগ্যই বলতে হবে, এই নাটকীয় মুহূর্তে রামু রুদ্ধদ্বারে টোকা দিল। তালুকদার উঠে পড়েন, এক্সকিউজ মি...

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেন।

রামু দুই প্লেট খাবারের ট্রে ও দু'কাপ চা নামিয়ে দিয়ে যায়।

তালুকদার দরজাটা পুনরায় ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ করে ফিরে এসে বসে পড়েন। বলেন, অপ্রিয় আলোচনাটা বরং খেয়ে নিয়ে হবে।

প্রণব চায়ের কাপটা টেনে নেয়। অনেকে খাবার খেয়ে চা পান করে, অনেকে চা-পানান্তে আহারে মন দেয়। প্রণব দ্বিতীয় দলে।

তালুকদার আবার প্রথম দলে। ফ্রেঞ্চ-টোস্টের পাত্রটা টেনে নিয়ে বলেন, কল্যাণকে চেন ? কল্যাণ সেনগুপ্ত, আই. পি. এস.?

—বাঃ। স্যারকে চিনব না ? উনি এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে। দিল্লীতে পোস্টেড। ওঁকে চেনেন বুঝি ?

—কল্যাণ আমার ছাত্র ছিল। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়। তারপর আই. পি. এস.।

আহার এবং চা-পানান্তে আবার সেই অনিবার্য অপ্রিয় প্রসঙ্গ। তবে প্রণব জিনিসটা সহজ করে পরিবেশন করল। পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড-সাইজ রঙিন ফটোগ্রাফ বার করে বললে: দেখুন তো স্যার, এ মেয়েটিকে চেনেন?

হ্যাঁ, মালিনীরই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—যদি তিনি থাকেন—মেয়েটি বিবস্ত্রা নয়। দেখে নিয়ে প্রফেসার তালুকদার ফেরত দেন, হ্যাঁ, চিনি!

—এই মেয়েটিই মোহজাল বিস্তার করে, টেলিফোনে ডেকে আপনাকে ঐ এইট বাই টোয়েন্টি অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যায়। তাই নয়?

নতমস্তকে স্বীকার করলেন মাথা নেড়ে।

—কত টাকা দিয়েছিলেন ওকে?

চমকে চোখে-চোখে তাকান। বলেন, টাকা! না, টাকা তো কিছু দিইনি!

—কিন্তু ঐ মেয়েটির সঙ্গে আপনি তো এক বিছানায় শুয়েছিলেন।

তালুকদার নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

প্রণব স্পষ্টস্বরে বললে, অস্বীকার করে লাভ নেই, স্যার। একটা খামের উপর আপনার নাম-ঠিকানা লেখা। আর ভিতরে আপনাদের দুজনের ছয়খানা ফটোগ্রাফ। আপনি হয়তো খেয়াল করেননি, মেয়েটির শয়নকক্ষে জোরালো বাতি ছিল। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কেউ আপনাদের দু'জনের ফটো তুলেছিল।

তালুকদার দুহাতে নিজের মুখ ঢাকলেন।

—আপনি বলতে চান, ফটোর কথা আপনি আদৌ জানতেন না?

মুখ থেকে হাত সরল না। শিরশ্চালনে জানালেন, উনি তা জানতেন না।

—অর্থাৎ আমার কাছে এইমাত্র জানলেন?

—হ্যাঁ, তাই। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেই শয়তানীটা....

—না স্যার! সে শয়তানী নয়! সেও এক হতভাগিনী। ব্ল্যাকমেলিং-এর শিকার। তারও জীবনে একবার পদস্খলন হয়েছিল। আর বাকি জীবন তারই মাশুল দিয়ে চলেছে।

এতক্ষণে সত্যই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন উনি। আর অভিনয় নয়। মুখ থেকে হাতটা সরে গেল। বললেন, মানে?

প্রণব বুঝিয়ে বলে:

মেয়েটি খানদানী বড় ঘরের। পড়াশুনাতেও দুর্দান্ত। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় পদস্খলন হয়। পদস্খলন ঠিক নয়। অপাত্রে বিশ্বাস করা যদি অপরাধ হয় তবে তাই। ছেলেটা ওকে ফেলে পালিয়ে যায়। ওর পরিবারের ধারণা অপহৃতা মেয়েটি মারা গেছে। বাস্তবে ওর একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল : জীবন।

তালুকদার চম্‌কে উঠে বলেন, কী বললে? জীবন? জীবক নয়?

—আজ্ঞে না। কেন? জীবক হতে যাবে কেন?

—কিছু না ! আমারই ভুল। তারপর ?

—ওর ঐ সন্তানটাই হচ্ছে ঐ মস্তান পার্টির ট্রাম্প কার্ড। মেয়েটি যদি কোনো সময় বেশ্যাবৃত্তি করতে অস্বীকৃতা হত, তাহলে ওরা ভয় দেখাতো জীবনকে পঙ্গু করে ভিক্ষাজীবী বানিয়ে মায়ের অপরাধের শোধ নেবে। প্রতি মাসে দূর থেকে জীবিত জীবনকে দেখতে পাওয়াই ছিল ওর জীবনধারণের একমাত্র সান্ত্বনা। অবিবাহিত ছোট বোনদের কথা ভেবে সে আত্মপ্রকাশও করেনি।

—মেয়েটি এখন কোথায়, প্রণব ?

—সে মুক্তি পেয়েছে। ছেলেকেও পেয়েছে। নিজের পরিবারে সে ফিরে যেতে চায়নি। সোশাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে মা-ছেলের একটা রিহ্যাবিলিটেশানের ব্যবস্থা হচ্ছে। দিল্লীতে। মেয়েটি একটা অর্ফানেজে চাকরি পাবে...

—ঐ মস্তান পার্টি সেখানে আবার গিয়ে...

—না, স্যার ! মেয়েটির দুঃস্বপ্নের অবসান হয়েছে। তার সাহায্যে আর ব্ল্যাকমেলিং করা যাবে না। ওর অবৈধ সন্তানটি ঐ অর্ফ্যানেজেই থাকবে, মাও ওখানে চাকরি করবে....

তালুকদার অস্ফুটে বললেন, থ্যাঙ্ক গড !

ঈশ্বর আছেন কিনা এ প্রশ্নটা কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ল না বিজ্ঞানভিক্ষুর।

আবার কিছুটা নীরবতা। অধ্যাপক তালুকদারই সে নীরবতা ভেঙে বললেন, বিশ্বাস কর প্রণব, কাজটা যে বে-আইনী তা আমি আদৌ জানতাম না।

প্রণব চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললে, আপনাকে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। আপনি কোনও বে-আইনি কাজ করেননি। 'প্রস্টিট্যুশান' এ দেশে 'ওপেন প্রফেশন'। তাছাড়া আপনি বলছেন, ওকে কোনো টাকাও দেননি। মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন নয়, আর সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক ..... এমনকি ঐ ফ্ল্যাটে আপনি অনধিকার প্রবেশও করেননি। মেয়েটির আহ্বানে তারই ফ্ল্যাট মনে করে...

—তাহলে তুমি কী অনুসন্ধান করতে এসেছ আমার কাছে ?

—আপনার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার বিষয়ে আমাদের, মানে পুলিসের, কোনো কৌতূহলই নেই। কোনো জিজ্ঞাস্যও নেই। আমার বড়কর্তার ধারণা ওরা—বাই দ্য ওয়ে, ওরা ছিল দুজন, গুরু আর চেলা—ওরা ঐ মেয়েটির সাহায্যে অর্থবান, বয়স্ক ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের ঐ অ্যাপার্টমেন্টে টোপ ফেলে টেনে নিয়ে যেত। তারপর বিশেষ মুহূর্তে পর্দার আড়াল থেকে ফটো তোলা হত। এইভাবে এ পর্যন্ত বাইশজন মানুষকে ওরা কবজা করেছে। তারপর ঐ ফটো দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেলিং শুরু হয়ে যেত। এটাই ছিল ঐ গুরু-শিষ্যের ব্যবসা।

গুরু-শিষ্য ! নেপো আর মাস্তান। কে গুরু ? কে চেলা ? তালুকদারের মনে যে এই সব প্রশ্ন জাগছে তা তাঁর মুখ দেখে আদৌ বোঝা গেল না।

তিনি নির্বাক তাকিয়ে রইলেন প্রণবের মুখের দিকে।

—এইবার বলুন স্যার, কী করে মেয়েটির সন্ধান পেলেন ?

উনি সংক্ষেপে জানালেন তা। ট্যাক্সির গর্ভে পত্রিকা পাওয়া থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ। ট্যাক্সি নিয়ে 'মেঘচুম্বিত' অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া। তারপর অভিজ্ঞতাটা একেবারে সংক্ষেপিত করে বললেন, হঠাৎ দরজায় কলবেল বেজে ওঠায় উনি তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন, মেয়েটিকে কোনো টাকাকড়ি না দিয়েই।

—তারপর ? টেলিফোন কলটা কখন পেলেন ?

—না। তারপর মেয়েটি তো আমাকে টেলিফোন করেনি।

—মেয়েটি নয়। আমি মস্তান অ্যান্ড পার্টির কথা বলছি।

—আহ্ মাস্তান। হ্যাঁ, মাস্তান বলে একজন আমার শালাকে ফোন করেছিল। প্রিন্সিপাল-সাহেবকেও ফোন করেছিল। কিন্তু আমাকে তো করেনি।

—তার মানে আপনার কাছে কেউ কোনো টাকা দাবী করেনি ? ঐ ফটো আর নেগেটিভ ফেরত দেবার প্রস্তাব করে ?

—না ! ফটো যে তোলা হয়েছে, তাই তো জানতাম না আমি।

—আই সী ! আমার মনে হয় আপনার দান আসেনি বলেই। বাইশ জন মানুষকে দোহন করছিল তো ওরা ? একে একে অগ্রসর হচ্ছিল। আপনার শ্যালক ও প্রিন্সিপ্যালকে বাজিয়ে রেখেছিল। আশা করেছিল, তাঁরা আপনাকে কিছু বলবেন। আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকবেন। সে যাই হোক, আপনি বলছেন যে, আপনার কাছে ব্ল্যাকমেলের প্রস্তাব নিয়ে কেউ আসেনি। তাই তো ?

—না, আসেনি। বোধহয় আমার দান আসার আগেই তোমরা ট্যাংরার বস্তিতে রেড করেছ। ... একটা কথা, ঐ ছবিগুলোর কী হবে ?

—আমি যে মুহূর্তে লালবাজারে রিপোর্ট করব যে, আপনার সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনো যোগাযোগ নেই, তখনই ওরা আপনার খামটা পুড়িয়ে ফেলবে। মাননীয় নাগরিকদের বেইজ্জত করার কোনো বাসনা আরক্ষা-বিভাগের নেই।

—কিন্তু তোমরা যখন তদন্ত করে বেড়াচ্ছ, তখন ব্ল্যাকমেলারকে একদিন না একদিন আদালতে তুলবেই। সেদিন কোনো-না-কোনো মাননীয় নাগরিক তো বেইজ্জতের চূড়ান্ত হবেন।

প্রণবের চা-জলখাবার শেষ হয়েছিল। এখন তার একটু ধূমপানের নেশা চেগেছে। বৃদ্ধ অধ্যাপকের সম্মুখে সে সিগারেটটা ধরাতে চায় না। উঠে দাঁড়ায়। বলে, না, স্যার। ঘটনাচক্রে কোনো মাননীয় নাগরিকই এই বিশেষ ক্ষেত্রে বেইজ্জত হবেন না। আমরা কোনো আদালতে এভিডেন্স হিসাবে ঐ বাইশজনের কোনো ফটোগ্রাফই দাখিল করব না।

—তাহলে ঐ ব্ল্যাকমেলারদের কন্‌ভিকশন হবে না ? শাস্তি হবে না ?

একগাল হেসে প্রণব মজুমদার বললে, ওর কনভিকশন হয়ে গেছে, স্যার। ওর একার নয়, দুজনেরই। —গুরু আর চ্যালার। ডেথ্ পেনালটি !

তালুকদার অবাক হয়ে বললেন, ডেথ্ পেনাল্টি ! হাইকোর্টে ?

—না স্যার। হায়ার কোর্টে ! —উপরের ঘূর্ণমান সিলিং ফ্যানটার দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

প্রফেসর সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। বোঁ-বোঁ করে ফ্যানটা ঘুরছে।

বললেন, তার মানে ?

—তার মানে, আমি এখানে কোন ব্ল্যাকমেলিং-এর চার্জের জন্য এনকোয়ারি করতে আসিনি, স্যার। চার্জটা ব্ল্যাকমেলিং নয়।

—তাহলে ?

—মার্ডার ! খুন !

প্রফেসার তালুকদার এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধবিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর যেন কণ্ঠস্বর ফিরে পান। বলেন, মার্ডার ! তার মানে ঐ অ্যান্টিসোশাল গুন্ডা দুটো কাউকে খুন করেছে ?

—আজ্ঞে না। ঐ গুরু-শিষ্য দুজনেই খুন হয়ে গেছে।

—গুড হেভেন্স ! কী ভাবে ? গুলিতে ? রিভলভারের ?

—এবারেও আপনার অনুমানে ভুল হল, স্যার ! এত ভুল তো সচরাচর আপনি করেন না, স্যার ?

প্রফেসর তালুকদার গম্ভীর হয়ে যান। সামলে নিয়ে বলেন, তবে কীভাবে ?

—বলছি। কোনো একজন 'এ-ওয়ান' ধুরন্ধর ওস্তাদের শেষরাত্রের প্যাঁচে। তিনি ঐ মস্তানের দাবী মেনে নেন। ব্ল্যাকমেলিঙের টাকাটা মিটিয়ে দেন একটা মজবুত কালো রঙের স্টীলের ক্যাশবাক্সে। ওরা গুরু-শিষ্য কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। দুজনেরই আশঙ্কা ছিল যে, পার্টনার-ইন-ক্রাইম ডবল্-ক্রশ করবে। তাই ক্যাশবাক্সটা খোলার সময় দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল দশ বিশ টাকার নোটের বান্ডিল গুন্তি করতে। চাবিটা সেলোটেপ দিয়ে বাক্সের গায়েই আটকানো ছিল। চাবি লাগিয়ে পাল্লাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হয়। টালিঘরের আধখানা ছাদ উড়ে যায়। গুরু আর চেলার দেহ শতচ্ছিন্ন। কোন্টা কার হাত, আর কোন্টা কার পা, তা জিগ্স পাজল-এর মতো পুলিসকে মেলাতে হয়েছে। শিষ্যকে সনাক্ত করা গিয়েছে তার একটি টিপিক্যাল টম্যাটো রঙের স্পোর্টস্ গেঞ্জি দেখে, আর গুরুর মাথায় হেলমেট পরা ছিল বলে তার মুণ্ডুটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়নি। দুজনের নামেই একাধিক পুলিস কেস ছিল। সনাক্ত করার কোনও অসুবিধা হয়নি।

মরা পাবদা মাছের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন অধ্যাপক তালুকদার। মুখটা হাঁ।

ডিটেকটিভ-সার্জেন্ট বুঝিয়ে বলে, আসলে বাক্সটা ছিল একটা বুবি-ট্র্যাপ। ইঁদুর-মারা কলের স্প্রিং-এর স্টোর-করা স্ট্যাটিক্ এনার্জি পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কাইন্যাটিক এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে ড্রাই সেল ব্যাটারির ফিউজ দুটিকে জুড়ে দেয়। ইলেকট্রিক স্পার্ক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

তালুকদার জিব দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বলেন, য়ু মীন বোমা? বোমা বিস্ফোরণ? ক্যাশবাক্সে বোমা এল কোথা থেকে?

প্রণব হাসতে হাসতে বললে, বোমা-পেটো আজকাল রাম-শ্যাম-যদুও বানায়, স্যার। পাড়ায় পাড়ায়—

—তা বটে!

—কিন্তু এটা কোন রাম-শ্যাম-যদুর হাতের কাজ নয়।

তালুকদার ইতস্তত করে বললেন, এ কথা কেন বলছ?

—কারণ এটাতে ছিল 'মাস্টার টাচ'! কে বানিয়েছেন তা নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না, স্যার! তিনি ধরণীর পাপের ভার কিছুটা লাঘব করেছেন। তিনি আমাদের নমস্য....

তালুকদার ক্ষীণ প্রতিবাদ না করে পারেন না, না, না, তা বললে কি চলে? সবাই যদি এভাবে আইন নিজের হাতে নেয়....

প্রণব হেলমেটটা বগলদাবা করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এ-কথায় একগাল হেসে বলে, না, স্যার! সবাই তা পারে না। এক্সপ্লোসিভে বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছি বলেই আমাকে এই তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে। এন্‌কোয়ারি করে আমি যা বুঝেছি তা আমি আমার রিপোর্টে লিখতে পারব না। তবে আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনাকে চুপি চুপি জানিয়ে যেতে পারি—আপনি বুঝবেন!

তালুকদার কোনও কৌতূহল দেখালেন না। তা সত্ত্বেও প্রণব একই নিশ্বাসে বলে গেল, আমি নিশ্চিত, ঐ বুবি-ট্র্যাপটা যিনি বানিয়েছেন তিনি কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, এবং উদ্ভাবনী প্রতিভায় অদ্বিতীয়! হি ইজ আ জিনিয়াস!

তালুকদারের কণ্ঠনালী শুকিয়ে ওঠে।

প্রণব বলে চলে, তবে আপনার ও কথাটাও খাঁটি! হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট। আইন কেউ নিজে হাতে নিতে পারে না। আমরা তা অ্যালাও করতে পারি না। আপনি ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার, আমরা শেষ পর্যন্ত তদন্ত করে দেখব। এক-এক করে ঐ একুশ জনকেই....

—একুশ?

—নয়? আজ আপনার বারে বারে এমন ভুল হচ্ছে কেন, স্যার? এখন তো একুশই বাকি থাকল। আপনি তো ব্ল্যাকমেলিঙের শিকার হননি আদৌ। ফটোগুলোর অস্তিত্বই জানতেন না। দেয়ারফোর বাইশ মাইনাস এক, ইজুক্যালটু একুশ। আচ্ছা

চলি, স্যার। তবে যাওয়ার আগে আপনার পায়ের ধুলো একটু নিয়ে যাব।

অধ্যাপক তালুকদার অনুমতি দিতে পারলেন না।

আপত্তি করতেও পারলেন না।

প্রস্তর মূর্তির মতো শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রণব নিচু হয়ে ওঁর পদধূলি নিল। হেলমেটটা মাথায় চড়ালো। তারপর নির্গমন দ্বারের দিকে একপা এগিয়ে আবার হঠাৎ থমকে থেমে পড়ে।

আবার পিছন ফেরে।

অধ্যাপক তালুকদার অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি বুঝতে পেরেছেন, ঐ প্রণব মজুমদার কোন 'এন্‌ডেঞ্জার্ড স্পেসিস্'-এর দুর্লভ একটি উদাহরণ। ঐ যে মুষ্টিমেয় কিছু পুলিস অফিসার আজও টিকে আছে, যাদের জন্যে এই সর্বব্যাপী দুর্নীতির মধ্যেও মানুষ বেঁচে আছে, শান্তি-শৃঙ্খলার কিছুটা আজও বজায় আছে। পার্টি-ইন-পাওয়ারের প্রতিবন্ধকতার প্রভাবে গুণ্ডা-মস্তান দমন করতে পারে না বলে যারা নিজের নিজের হাত কামড়ায়। প্রণব সেই 'দুর্লভ-প্রাণী'র একটি দৃষ্টান্ত!

প্রণব বলে, একটা কথা বলতে ভুলেই যাচ্ছিলাম। আপনি আমার একটা উপকার করবেন, স্যার?

অধ্যাপক তালুকদার দুরু দুরু বুকে বলেন, বলো?

—আমি চলে গেলে ডক্টর সেনের বাড়িতে একটা টেলিফোন করবেন, স্যার! ডঃ অপরেশ সেন। তাঁর মেয়ে আজ নিয়ে পাঁচ দিন অনশনে আছে। কেউ তাকে কিছু মুখে দেওয়াতে পারেনি...

—শুনেছি! কিন্তু আমার কথাই বা সে শুনবে কেন?

—শুনবে! কারণ আপনি যে তাকে ঐ সঙ্গে আরও একটা খবর জানিয়ে দেবেন : শ্রীযুক্ত লালমোহন বিশ্বাস মশাই দেহ রেখেছেন।

তালুকদার-সাহেব চম্‌কে ওঠেন, কী বললে! লালমোহন বিশ্বাস?

—আজ্ঞে না। তা তো বলিনি আমি—

—তবে কার কথা বলছ? কে মারা গেছেন?

—শ্রীযুক্ত লালমোহন বিশ্বাস 'মশাই'! পার্টির সম্মানিত কর্মী ছিলেন তো!

তালুকদার বুঝতে পারেন প্রণব অতি ধুরন্ধর গোয়েন্দা। রুদ্ধদ্বার কক্ষে তিনি মহিম হালদারকে কী ভাষায় কথা বলেছেন তা পর্যন্ত জানে।

উনি জানতে চান, লালমোহন বিশ্বাস মশাই হঠাৎ কীভাবে দেহ রাখলেন, প্রণব?

—সে কথাই তো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম, স্যার। বোমা বিস্ফোরণে। বুবি-ট্র্যাপের খপ্পরে পড়ে।

এমন একটা সন্দেহ ওঁর নিজেরও হয়েছিল। এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হলেন। বলেন, কিন্তু এ খবরটা তো কৃষ্ণাকে যে কেউ জানাতে পারে। পারে না?

—বাস্তবতার বিচারে পারে, নৈতিকতার অগ্রাধিকারে পারে না। সে অধিকার যে নিজ শৌর্যে অর্জুন করেছেন আপনি। কী করে অমন অগ্রাধিকার আপনার হল, তা আমার কাছে জানতে চাইবেন না, স্যার ! সে কথা আমরা আলোচনা করতে পারি না। প্রফেশনাল এথিক্সে বারণ।

হেলমেট নাড়িয়ে আবার একটি 'বাও' করে প্রণব বেরিয়ে যায় অন্ধকারে।

প্রায় এক মাস পরের কথা।

দেবু আর কৃষ্ণা ইতিমধ্যে একদিন এসে ওঁকে যুগলে প্রণাম করে গেছে। দুজনেই এখন হাঁটা-চলা করতে পারছে।

হঠাৎ একদিন দিল্লী থেকে ডাকে একটা চিঠি পেলেন। মাদার টেরিজার স্নেহধন্য একটি অনাথ আশ্রমের মহিলা সেক্রেটারির ইংরেজিতে ছাপানো আবেদনপত্র। ওঁর প্রতিষ্ঠানে পিতৃপরিচয়হীন হতভাগ্যদের মানুষ করার, মনুষ্যত্বের দাবী মিটিয়ে দেবার চেষ্টা হয়।

ছাপানো আবেদন-পত্রটা কিন্তু বুক-পোস্টে আসেনি।

এসেছে মুখবন্ধ খামে। তাই পুরো ডাকটিকিট লেগেছে।

ইংরেজি আবেদন-পত্রের তলায় সাদা বাঙলায় গোটা গোটা হরফে কে যেন লিখেছে :

"প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি..."

প্রফেসর তালুকদার প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ পেলেন।

প্রায়শ্চিত্ত ? না পাপ তিনি কিছু করেননি। প্রণব মজুমদারের ভাষায় ধরণীর পাপের ভার কিছুটা লাঘব করেছেন মাত্র। কবি সাহিত্যিক হিসাবে সমাজের প্রতি যা তাঁর প্রতিশ্রুতি :

"দু একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।"

বরং বলা উচিত উপযুক্ত পাত্রে করুণা প্রদর্শনের একটা সুযোগ পেলেন মাতা আম্রপালীর উদাত্ত পুকারে।

দেরাজ খুলে চেক বইটা বার করে আনলেন উনি।

পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক লিখতে।

"......আমি সাহিত্যিক......আমি কথাশিল্পী...আমি কবি। সমাজের কাছে আমি দায়বদ্ধ—'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর, তার পরে ছুটি নিব'।...আমি যেমন গৌতম বুদ্ধ নই, তেমনি কৃষ্ণাশ্বর ঋষিও নই। ঠিক জানি না...হয়তো শুধু সত্যের সন্ধানে নয়, সৌন্দর্যের সন্ধানেই আমি ছুটে এসেছিলাম—ঠিক [illegible] আগে প্রাক্সিটেলেস ছুটে যেতেন ফ্রিনের [illegible] আমি [illegible] চাই, তুমিও কি তা পার না কল্যাণী? [illegible] মতো [illegible] এই তিনশ বছরের বুড়ি [illegible]